অক্টোবর ২০১৯ ❑ আশ্বিন - কার্তিক ১৪২৬

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা

বিশ্ব শিশু দিবস

রাফান ইবনে মেহেদী, তৃতীয় শ্রেণি, বি. এ. এফ. শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

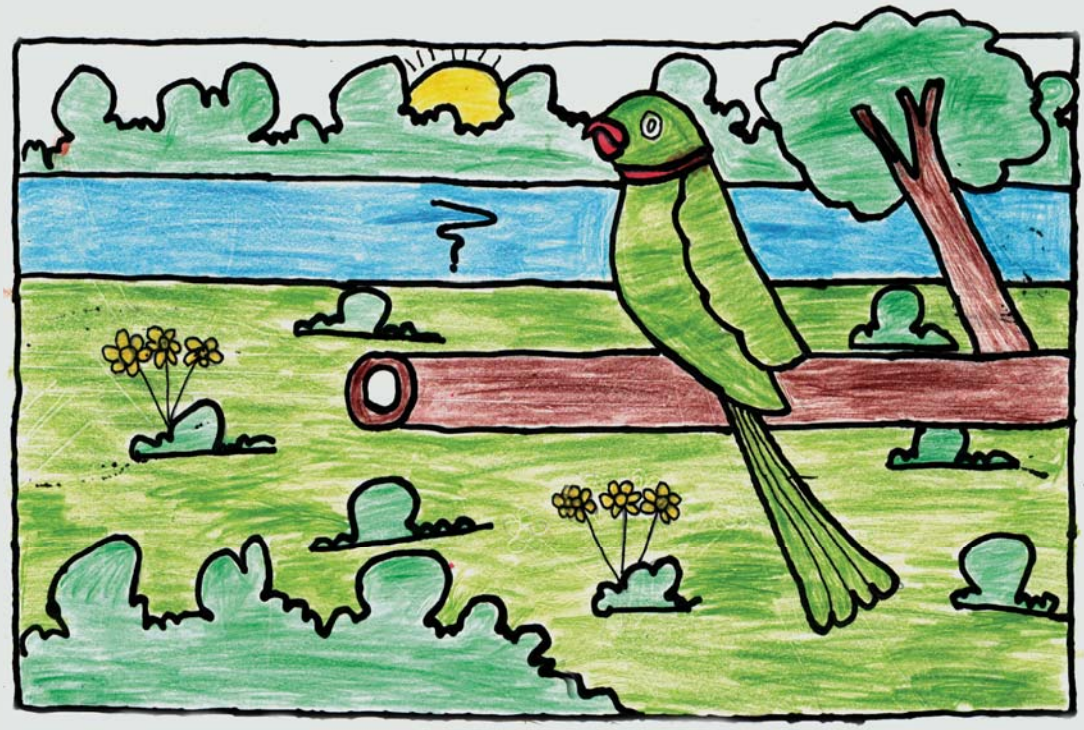

শ্রাবণ সরকার, তৃতীয় শ্রেণি, এস. এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
অক্টোবর ২০১৯ ❑ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৬

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২ সার্কিট হাউস রোড ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেলের জন্মদিন।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। ১৯৬৪ সালের এই দিনে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পড়তেন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে। ভাই-বোনদের মধ্যে সবার ছোটো শেখ রাসেল ছিলেন সবার আদরের। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের নির্মম বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পায়নি বঙ্গবন্ধুর এই শিশুপুত্রও। সেই রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হত্যা করে ছোট্ট রাসেলকেও। কিন্তু শেখ রাসেল বেঁচে আছেন আজো সবার মাঝে। বাংলাদেশের শিশু-কিশোর, সকলের কাছে শেখ রাসেল এক ভালোবাসার নাম।

শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে বিশ্ব। তাদের অধিকার নিয়ে জাতিসংঘ ৫৪ অনুচ্ছেদের একটি শিশু অধিকার সনদ তৈরি করেছে। এই সনদে স্বাক্ষরকারী ১২৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তাই তো শিশুরদের সম্মানে বিশ্বে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার পালন করা হয় 'বিশ্ব শিশু দিবস'। বাংলাদেশেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়। নবারুণ-এর পক্ষ থেকে এ দিবসে রইল সকল শিশুর জন্য অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

সূচি

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে

০৯ প্রতিযোগিতা/মুস্তাফা মাসুদ

শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে

০৩ আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা/ বিনয় দত্ত
০৭ ওলা/জাকির হোসেন কামাল

নিবন্ধ

২১ বিশ্ব শিশু দিবস/শাহানা আফরোজ
৪৩ এসব শব্দ ব্রাজিলেও আছে!/তারিক মনজুর
৫১ অর্থবহ পতাকায় বাংলাদেশ/আনোয়ারুল হক
৫৩ লাল কলা/অর্ক রায় সেতু
৫৪ শিশু নির্যাতনকারীদের ক্ষমা নেই: প্রধানমন্ত্রী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৫ কথা বলা রোবট/শাহানাজ সুলতানা
৫৬ যক্ষ্মার নতুন ওষুধ/মো. জামাল উদ্দিন
৫৭ সাঁতারে এনির বাজিমাত/জান্নাতে রোজি
৫৮ নয় বছরেই কিস্তিমাত/ মেজবাউল হক
৫৯ পোষা প্রাণীর দিবাযত্ন কেন্দ্র/সৈয়দ জান্নাতুল নাঈম
৬০ দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

বিজ্ঞান

৫০ শিং ওয়ালা নারহোয়েল/অনিক শুভ

কবিতা

২২ চন্দনকৃষ্ণ পাল
২৬ রহীম শাহ/ নাসিরুদ্দীন তুসী/ মোহ্‌সেন আরা
২৭ আবদুল কুদ্দুস ফরিদী/ শামসুল করীম খোকন
প্রজীৎ ঘোষ/ মো. সাফায়াত হোসেন
৩৮ শরীফ আব্দুল হাই/ মো. ফিরোজ খান
/ মো. আবির হোসেন

গল্প

১৬ রাজকুমারী রিমঝিম/মোজাম্মেল হক নিয়োগী
২৩ ছোট্ট মেয়ে ইনি ও রানি পিঁপড়া/আহমাদ স্বাধীন
২৮ ইচ্ছেবুড়ি ও কথা বলা ময়না/পলাশ মাহবুব
৩৬ মিঠুনের স্বপ্ন/টি. এম তাহ্‌সিনা এনাম তৃষা
৪৫ সাহসী ছেলে/নাসিম সুলতানা
৪৭ জলপরির গল্প/সাবরিনা আক্তার

ছড়াগল্প

৪৮ কামাল হোসাইন

অনুবাদ রূপকথা

৩৩ বাতাবি গাছ ও শিম্পাঞ্জি/মোস্তাফিজুল হক

ভূত দিবস উপলক্ষ্যে

৩৯ ভ্রমণ গল্প/হাফিজ উদ্দীন আহমদ

স্মৃতি গাথা

১৩ একাত্তরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা
লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: রাফান ইবনে মেহেদী/ শ্রাবণ সরকার
শেষ প্রচ্ছদ: শুচি ইসলাম

১৫ মালিহা আন্‌জুম
২৫ হাসান আবরার মাহির
৩২ মুসতাহসান মুহাইমিন
৪৬ ইউসুফ হায়দার আদিব
৫২ ইয়াফি মুকসিত
৫৯ সায়মাহ্‌ তাবাস্‌সুম
৬২ তাসফিয়া জামান তাসনিম/ আয়ান হক ভূঁঞা

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ-এর আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা

বিনয় দত্ত

শেখ রাসেল নামটি শুনলেই প্রথমে যে ছবিটি সামনে আসে তা হলো হাস্যোজ্জ্বল, প্রাণচঞ্চল একজন ছোট্ট শিশুর দুরন্ত শৈশব। যে শিশুর চোখগুলো হাসি-আনন্দে ভরপুর। সুন্দর মুখাবয়ব। যে মুখাবয়ব ভালোবাসায় মাখা। যার অগোছালো চুলের ভাঁজে লুকিয়ে আছে দুরন্ত কৈশোরের পড়ন্ত বিকেলের রোদ।

এই কোমলমতি শিশুটিকে আমরা হারিয়েছি ইতিহাসের এক জঘন্য রাতে। যে রাতটি ছিল বিভীষিকাময়। সেই রাতের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত আমরা এখনো গভীর শোকের সাথে স্মরণ করি। আমি এখনো ভাবি, কারো বিরুদ্ধে কারো শত্রুতা থাকতেই পারে কিন্তু সেই শত্রুতা একজন কোমলমতি শিশুকে কেন কেড়ে নিবে? এই শিশু কী দোষ করেছিল? সে তো কোনো রাজনীতির অংশ নয়? সে আজন্ম শৈশবে ঘুরছিল, খেলছিল নতুন বসন্তের ডালে ডালে, দুরন্তপনায় মেলেছিল নিজের শৈশবের ডালি। সে কেন এই হত্যাকাণ্ডের অংশ হবে?

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত হয় 'আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা'। বইটিতে বিভিন্ন স্মৃতির কথা লিখেছেন রাসেলের বড়ো বোন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ছোটো বোন শেখ রেহানা। তাদের স্মৃতিমালা থেকে আমরাও জানতে পারি রাসেল সম্পর্কে। ছোট্ট রাসেল সেই বয়সেই কতটা পরিপক্ক ছিল, কতটা ভালোর মিশেলে ছিল তার শৈশব।

রাসেলের জন্ম ১৯৬৪ সালে ১৮ই অক্টোবর ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কের বাসায়। সেই সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন চট্টগ্রামে। তার জন্ম পরিবারের সকলের কাছে ভিন্ন আনন্দের মাত্রা যোগ করে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন রাসেলের বেড়ে উঠার প্রতি ক্ষণে। তিনি রাসেলকে বাবা ডাকতে শিখিয়েছিলেন। 'আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা' বইটিতে জন্মের মুহূর্ত লিখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'রাসেলের জন্ম হয় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কের বাসায়, আমার শোবার ঘরে। দোতালার কাজ তখনও শেষ হয়নি। বলতে গেলে মা একখানা করে ঘর তৈরি করিয়েছেন। একটু একটু করেই বাড়ির কাজ চলছে। নীচতলায় আমরা থাকি।

উত্তর-পূর্ব দিকের ঘরটা আমার ও কামালের। সেই ঘরেই রাসেল জন্ম নিলো রাত দেড়টায়।'

একই বইতে শেখ রেহানা লিখেছেন, '... রাসেলের জন্ম হয় অনেক রাতে। আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার মেজ ফুফু ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, জলদি ওঠ, তোমার ভাই হয়েছে। জন্মের পরে ওকে আমার মনে হয়েছিল একটা পুতুল। কী সুন্দর হাসে, আবার কাঁদেও। রাসেল একটু একটু করে বড়ো হয়ে ওঠে। মা ও আব্বা নাম রাখলেন রাসেল। স্কুলের নাম ছিল শেখ রিসালউদ্দীন। হাসু আপা ওকে কোলে করে কত গান শোনাত, কত কবিতা শোনাত। কামাল ভাই আর জামাল ভাইও কোলে নিত। আমিও নিতাম। ভয়ও করতাম যদি পড়ে যায়। যদি ব্যথা পায়। ওর খুব কষ্ট হবে।'

'কারাগারের রোজনামচা' বই-এ বঙ্গবন্ধু অসংখ্যবার রাসেলের কথা বলেছেন। ছোট্ট রাসেল তার কাছে যে খুব প্রিয় ছিল তাও উল্লেখ করেছেন পাতায় পাতায়। তিনি মাঝে মাঝে নিজেকে বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেন ছেলেটিকে সময় না দেওয়ার কারণে।

রাসেল নামকরণটা বেশ মজার। 'আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা' বই-এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'অনেক বছর পর একটা ছোট্ট বাচ্চা আমাদের বাসায় ঘর আলো করে এসেছে, আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। আব্বা বারট্রান্ড রাসেলের খুব ভক্ত ছিলেন। বারট্রান্ড রাসেলের বই পড়ে মাকে বাংলায় ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। মা রাসেলের ফিলোসফি শুনে শুনে এতই ভক্ত হয়ে যান যে, নিজের ছোটো সন্তানের নাম রাসেল রাখেন।'

রাসেলের শৈশব ছিল ভালোবাসায় মাখা। ভাইবোনদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত কে রাসেলকে আগে কোলে নিবে। কে তাকে আদর করে চোখে কাজল পরাবে, কে পাউডার মাখাবে এসবের মধ্যদিয়ে রাসেল একটু একটু করে বড়ো হয়ে উঠছিল। বাড়িতে ভাইবোনদের হাতে সে ছিল যেন এক পুতুল। তারা তাকে আদর করত, সাজাত, খাওয়াত, খেলত। তাকে ঘিরেই যেন বয়ে গিয়েছিল পুরো পরিবারের সুখ-আনন্দ।

দুই

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাসেলের মুখে বুলি ফোটা নিয়ে লিখেছেন, 'রাসেলের সবকিছুতেই যেন ছিল ব্যতিক্রম। ও যে অত্যন্ত মেধাবী তার প্রমাণ অনেকভাবেই আমরা পেয়েছি। আমাকে হাসুপা বলে ডাকত। কামাল ও জামালকে ভাই বলত আর রেহানাকে আপু। কামাল ও জামালের নাম কখনও বলত না। আমরা নাম বলা শেখাতে অনেক চেষ্টা করতাম। কিন্তু ও মিষ্টি হেসে মাথা নেড়ে বলত ভাই। দিনের পর দিন আমরা যখন চেষ্টা করে যাচ্ছি, একদিন ও হঠাৎ করে বলেই ফেলল, 'কামমাল', 'জামমাল'।'

রাসেলের জন্মের সময় থেকে অনেকটা সময় জুড়ে বঙ্গবন্ধু জেলখানায় ছিলেন। তাই রাসেলের সময় কাটতো একাকী। আর বঙ্গবন্ধু জেলে থাকায় বাসার সবার মনও খুব উচ্ছল ছিল না। শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি রাসেলকে একটা তিন চাকার সাইকেল কিনে দিলেন। রাসেলের যে বয়স তখন সেই সাইকেল চালানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারপরও সেই সাইকেল নিয়ে সারাদিন কেটে যেত। বাড়ির উঠোনের এ কোণ থেকে ও কোণে সাইকেল নিয়ে অনেকটা সময় পার করত।

সেই বয়সেই রাসেলের বুদ্ধির পরিচয় মেলে। বাসায় একটা ছোটখাটো লাইব্রেরি ছিল। লাইব্রেরির বই থেকে বোনেরা তাকে গল্প পড়ে শোনাত। একই গল্প কয়েকদিন পর আবার শোনানোর সময় দু-এক লাইন কোনো কারণে বাদ পড়লে সে ঠিকই ধরে ফেলত। বলত, 'সেই লাইনটা পড়নি কেন?'

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের মণিকোঠায় জায়গা করে নেয় ছোট্ট রাসেল। তাই যখনই বঙ্গবন্ধু বাসায় ঢুকতেন প্রথমেই 'রাসেল', 'রাসেল' বলে ডাক দিতেন। বঙ্গবন্ধুর ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গেই এক দৌড়ে রাসেল বাবার কাছে ছুটে আসত। রাসেলের ছুটে আসা দেখে মনে হতো, বঙ্গবন্ধুর এই ডাকের জন্য বোধহয় রাসেল এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। বঙ্গবন্ধু তাকে কোলে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে পরম আদরে মেতে উঠতেন। আদর করার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু তাকে সেই সময়ের গল্প শোনাতেন। বাঙালিদের শোষণ-নিপীড়নের গল্প রাসেলের বোঝার মতো ক্ষমতা হয়ত ছিল না, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই গল্প বলাটা রাসেলের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা পরে বোঝা যায়।

'আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা' বইটিতে প্রধানমন্ত্রী লিখছেন, 'চলাফেরায় ও বেশ সাবধানী কিন্তু সাহসী ছিল, সহসা কোনো কিছুতে ভয় পেত না। কালো কালো বড়ো বড়ো পিঁপড়া দেখলে ধরতে যেত। একদিন একটা ওল্লা (বড়ো কালো পিঁপড়া) ধরে ফেলল, আর সাথে সাথে পিঁপড়াটা ওর হাতে কামড়ে দিল। ডান

হাতের ছোট্ট আঙুল কেটে রক্ত বের হলো। সাথে সাথে ঔষধ দেওয়া হলো। আঙুলটা ফুলে গেল। তারপর থেকে আর ও ওল্লা ধরতে যেত না। তবে ওই পিঁপড়ার একটা নাম নিজেই দিয়ে দিলো। কামড় খাওয়ার পর থেকেই কালো বড়ো পিঁপড়া দেখলে বলত 'ভুট্টো'।' সেই ছোট্ট বয়সেই রাসেল বুঝেছিল জুলফিকার আলী ভুট্টোর মতো লোকরা কালো পিঁপড়ের মতোই ভয়ানক।

তিন

রাসেলের মহানুভবতার কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'মা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। রাসেলকে কোলে নিয়ে নীচে যেতেন এবং নিজের হাতে খাবার দিতেন কবুতরদের। হাঁটতে শেখার পর থেকেই রাসেল কবুতরের পেছনে ছুটত, নিজ হাতে ওদের খাবার দিত। আমাদের গ্রামের বাড়িতেও কবুতর ছিল। কবুতরের মাংস সবাই খেত। বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন অধিকাংশ জায়গা পানিতে ডুবে যেত, তরিতরকারি ও মাছের বেশ অভাব দেখা দিত। তখন প্রায়ই কবুতর খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তাছাড়া কারও অসুখ হলে কবুতরের মাংসের ঝোল খাওয়ানো হতো। রাসেলকে কবুতরের মাংস দেওয়া হলে ও খেত না। ওকে ওই মাংস খাওয়াতে আমরা অনেকভাবে চেষ্টা করেছি। ওর মুখের কাছে নিয়ে গেছি, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওই বয়সে ও কী করে বুঝতে পারত যে, ওকে পালিত কবুতরের মাংস দেওয়া হয়েছে!'

রাসেল শুধু যে মহানুভব ছিল তাই নয়, নম্র-ভদ্রও ছিল। ওই ছোট্ট বয়সে রাসেলের মধ্যে বিনয় ভাব ছিল প্রবল। এটা নিশ্চয় পারিবারিক শিক্ষা। সেই সময় রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল। ২০১৪ সালে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'আলোকের এই ঝরনাধারায়' শীর্ষক একটি প্রকাশনা বের করে। সেই সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন আফরোজা বেগম। তিনি সেই প্রকাশনায় লিখেছেন- 'চতুর্থ শ্রেণিতে পাঠরত ছোট্ট একটি ছেলে। মিষ্টি চেহারা, নম্র-ভদ্র-অমায়িক। হাঁটত নিচের দিকে তাকিয়ে। সামনে কোনো শিক্ষক পড়লে সামান্য উঁচু করে হাত তুলে লজ্জামিশ্রিত হাসি দিয়ে সালাম দিত।'

স্কুলে পড়াকালে সময়ে রাসেলের শিক্ষকদের প্রতি অনুরাগী আর বন্ধুবৎসল আচরণের উদাহরণ পাওয়া যায়। সেই সময় ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের

প্রিন্সিপাল ছিলেন রাজিয়া মতিন চৌধুরী। 'আলোকের এই ঝরনাধারায়' প্রকাশনায় তিনি লিখেছেন- 'রাসেল যতদিন এই স্কুলে পড়েছে কোনোদিন সে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবাধ্য হয়নি। সবাইকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। এ শিক্ষা হয়ত সে তার বাড়ি থেকে পেয়েছিল। রাসেল ছিল খুবই সাদাসিধে। সে যে গাড়িটিতে চড়ে স্কুলে আসত সেটি কোনো ঢাউস গাড়ি ছিল না বা ফ্ল্যাগওয়ালা গাড়িতে চড়ে কখনও সে স্কুলে আসত না। প্রতিদিন নির্ধারিত সময়েই সে ক্লাসে আসত। প্রধানমন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতির ছেলে বলে কোনো বাহুল্য বা আড়ম্বর তার মধ্যে ছিল না।'

রাসেল ছিল খুবই সাদাসিধে। সে যে গাড়িটিতে চড়ে স্কুলে আসত সেটি কোনো ঢাউস গাড়ি ছিল না বা ফ্ল্যাগওয়ালা গাড়িতে চড়ে কখনও সে স্কুলে আসত না। প্রতিদিন নির্ধারিত সময়েই সে ক্লাসে আসত। প্রধানমন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতির ছেলে বলে কোনো বাহুল্য বা আড়ম্বর তার মধ্যে ছিল না।

বন্ধুপরায়ণ হওয়ার নমুনা মিলে রাজিয়া মতিন চৌধুরীর লেখায়। অন্য এক শিক্ষকের কাছে তিনি এই কথাটি শুনেছেন। রাজিয়া মতিন চৌধুরী লিখেছেন, '১৪ আগস্ট অর্থাৎ স্কুলে তার শেষদিন টিফিন পিরিয়ডে দেখি একটি পোটলা দু'হাতে বুকে চেপে ধরে ছোট রাসেল ক্যান্টিন থেকে আসছে। দু'হাত জোড়া, তাই হাত না তুলেই সালাম জানালো শিক্ষককে। শিক্ষক তার হাতের ওই পোটলাতে কী জিজ্ঞেস করায় রাসেল উত্তর দিল, 'স্যার শিঙাড়া'। শিক্ষক হেসে বলল শিঙাড়া দিয়ে কী হবে জিজ্ঞেস করায় লাজুক রাসেল হাসিমুখে জবাব দিল 'বন্ধুদের নিয়ে খাব।'

'আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা' বইটিতে প্রধানমন্ত্রী লিখছেন, '...স্বাধীনতার পর এক ভদ্রমহিলাকে রাসেলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো। রাসেলকে পড়ানো খুব সহজ কাজ ছিল না। শিক্ষককে ওর কথাই শুনতে হতো। প্রতিদিন শিক্ষিকাকে দুটো করে মিষ্টি খেতে হবে। আর এ মিষ্টি না খেলে ও পড়তে বসবে না। কাজেই শিক্ষিকাকে খেতেই হতো। তাছাড়া সবসময় ওর লক্ষ্য থাকত শিক্ষিকার যেন কোনো অসুবিধা না হয়। মানুষকে আপ্যায়ন করতে রাসেল খুবই পছন্দ করত।'

চার

এতসব স্মৃতি স্মরণ করতে কষ্ট হয়। বুকে পাথর নিয়ে সেইসব স্মৃতির সাগরে ডুব দেই আমরা। কারণ সেইদিন ঘাতকের বুলেট যে কোমলমতি শিশুটির প্রাণ কেড়ে নিল–সে ছিল নির্দোষ, নিষ্পাপ। তার শৈশব ছিল আনন্দময়। যে শৈশব এত সৌন্দর্যময় সে আজ বেঁচে থাকলে কি করত? এই ভাবনাটা আমাকে প্রায়ই ভাবায়।

আজ এত বছর পরেও আমরা শেখ রাসেলকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। কারণ রাসেল তার ব্যবহারে, শৈশবে, মহানুভবতায় ছিল অমায়িক। আমাদের সবারই ধারণা রাসেল যদি বেঁচে থাকত হয়ত আমরা আজকে এমন একজন মহানুভব, দূরদর্শী, আদর্শ নেতা জাতির জন্য পেতাম–যাকে নিয়ে জাতি গর্ব বোধ করত। ■

তথ্যসূত্র

১. 'কারাগারের রোজনামচা', শেখ মুজিবুর রহমান
২. 'শেখ মুজিব আমার পিতা', শেখ হাসিনা
৩. 'রাসেলের গল্প', বেবী মওদুদ
৪. 'আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা', জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত
৫. 'আলোকের এই ঝরনাধারায়', ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশনা

ভেলা

জাকির হোসেন কামাল

গত দু’ সপ্তাহ ধরে রাসেলের মন ভার। যেন শ্রাবণ মেঘের দিন। কারণ হাসু আপা নেই। দেনা আপু (ছোট্ট রাসেল শেখ রেহানাকে দেনা আপু বলে ডাকত) নেই। নেই ছোট্ট জয়ও, যার সাথে যখন তখন খেলা করবে, খুনসুটি করবে। অবশ্য বিকেল বেলা বেশ সময় দিয়ে গেছে বন্ধু আদিল ও ইমরান। এখন প্রায় দিনই আরিফও আসে। রাসেল একটু অসুস্থ। জন্ডিস না কি যেন বলে রোগটাকে। তাই এখন যখন তখন আর বাইরে যাওয়া হয় না তার। আগে অবশ্য প্রতিদিন আরিফদের বাসায় যাওয়া হতো রাসেলের। ফুপির হাতে দুধটা খেতে কি যে মজা।

রাসেলের মুখে হঠাৎ হঠাৎ খেলে যায় রোদের ঝিলিক। যখন মনে পড়ে হাসু আপা কদিন পরেই জার্মানি থেকে ফিরে আসবে, রাসেলের জন্য অনেক অনেক খেলনা নিয়ে। মন ভালো হয়ে যায়, যখন মনে পড়ে এবার দুলাভাই জার্মানি থেকে সাইকেল কিনে দেবে। আর ভাগ্নে জয়কে সাইকেল চালানো শিখাবে রাসেল। মন ভালো হয়ে যায়, কদিন পরেই টুঙ্গিপাড়া যাওয়া হবে। আম্মাও তাই বলেছেন। রাসেল তো কবে থেকেই অস্থির হয়ে আছে টুঙ্গিপাড়া যাওয়ার জন্য।

টুঙ্গিপাড়া খুব ভালো লাগে রাসেলের। বাড়ির কাছেই বাইগার নদী। অদূরে মধুমতির টলটলে জল। গাঁয়ের পাশে সবুজ ধানের ক্ষেত। সারা গাঁ জুড়ে সবুজের সমারোহ। গাছে গাছে পাখির কূজন। শেখ বাড়ির উঠোন, ঘরদোর, হিজলতলা কেমন যেন মায়াময়। হিজল তলায় গেলে ঝুপ করে জলে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করে রাসেলের। কিন্তু আপুদের জন্য পারে না। অথচ ছোট্টবেলায় নাকি আপুরা এখানে যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আর ছোটো তালাব বড়ো তালাবে তো রাসেলের একা একা যাওয়া বারণ। তবুও রাসেলের মনটা পড়ে থাকে টুঙ্গিপাড়ায়। টুঙ্গিপাড়ার আলো-ছায়ায়, মেঠো পথে।

টুঙ্গিপাড়া যাওয়ার জন্য কত যে প্রস্তুতি রাসেলের। টুঙ্গিপাড়ায় রাসেলের যে খুদে বাহিনী রয়েছে, ওরা না জানি রাসেলের জন্য পথ চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওদের জন্য রাসেল অনেক জামাকাপড়, চকলেট ও টাকাপয়সা সংগ্রহ করে রেখেছে। নাসের কাকা এক টাকার নোটের কড়কড়ে দুটো বান্ডিল দিয়েছে রাসেলকে। রাসেল এখনও সিদ্ধান্ত নিতে

পারেনি, প্রত্যেককে কত টাকা করে দেবে।

ইদানীং একটা বিষয় রাসেলকে খুব ভাবাচ্ছে। যত্রতত্র ওলা দেখা যাচ্ছে। কোথাও একটি কোথাও দুটি আবার কোথাও দলবেঁধে, কোথাও সারি সারি। ওলা মানে বড়ো পিঁপড়ে। রাসেল বড়ো কালো পিঁপড়েগুলোকে ভুট্টো বলে ডাকে। রাসেলের খুব মনে পড়ে ক-বছর আগের কথা। রাসেল তখন ওলাদের দেখলেই ধরতে যেত। একদিন একটা ওলাকে ধরার সাথে সাথেই বেশ জোরে কামড় দিয়েছিল রাসেলের আঙুলে। ওর নরম মাখনের মতো তুলতুলে ডান হাতের আঙুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছিল তখন। আঙুলটা ফুলে গিয়েছিল খুব। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভুট্টোরা ষড়যন্ত্র করছিল এদেশের বিরুদ্ধে, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে। এই ওলাদের দেখেও রাসেলের এসব কথা মনে পড়ে, গা শিউরে ওঠে। রাসেলের মনে হয় ছোটো ওলাদের মতো বড়ো ওলারাও দলবদ্ধ হচ্ছে। রাসেল ভাবতে থাকে, টুঙ্গিপাড়ায় গিয়েই আগের প্যারেডটা শুরু করতে হবে। ধানমন্ডির বন্ধুদের নিয়েও আরেকটি খুদে দল তৈরি করতে হবে। তাদের নিয়মিত প্যারেড করিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। টুঙ্গিপাড়ায় ওরা ডামি বন্দুকগুলো যত্ন করে রেখেছে কি না ভাবতে থাকে রাসেল। এখন একে আর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা মনে হয় না রাসেলের। মনে হয় সত্যিই আরেকটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচেছ রাসেল।

আজ রাসেলের খুব অস্থির লাগছে। ইস, আব্বাটা যে কী? সারাদিন কাজ আর কাজ। রাসেল শুয়ে পড়েছে মায়ের গলা ধরে। মাকে ছাড়া যে ঘুম আসে না। রাসেলের খুব ভালো লাগে বাবার বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে। সে সুযোগ আর তেমন পাওয়া যায় কই? কিন্তু আজ কেন জানি ঘুম আসছে না রাসেলের। হাসু আপার কথা মনে পড়ে। দেনা আপুর কথা মনে পড়ে। জয়ের কথা মনে পড়ে। এই মাঝ রাতে রাসেলের অদ্ভূত ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয়- আব্বা, মা, ভাইয়া ও ভাবিদের ডেকে ঘুম থেকে তুলে গল্প করতে। আজ রাতটা গল্প করে কাটিয়ে দিলে কেমন হয়? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, না থাক। আব্বা সারাদিন পরিশ্রম করে দেশের জন্য মানুষের জন্য। আব্বা বিশ্রামের তেমন সময়ই পান না। মাত্র ঘুমিয়েছেন মানুষটি। কাঁচা ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না। তাছাড়া মা একটা ধমকও দিতে পারেন। অবশ্য ভাবিরা একটু মজাও পেতে পারেন। আদর করে প্রিয় দেবরের গালটি টিপেও দিতে পারেন। সবার কথা মনে করে রাসেলের কেমন জানি কান্না পায়। রাসেল ভাবতে থাকে ইদানীং এত ওলা কেন দেখা যায়? রাসেল ভাবে, কাল সকালেই বিষয়টি আব্বার কাছে বলতে হবে। এর একটা বিহিত না করলে চলা ফেরাই দায় হয়ে যাবে। এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে রাসেল।

রাসেল ডামি বন্দুকটি পরিষ্কার করছিল বারান্দায়। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি অস্বাভাবিক বড়ো ওলা তার দিকে ছুটে আসছে। রাসেল দৌড় দিল সজোরে ঘরের দিকে। ওমা সামনে আরো দুটো ওলা। এগুলো আরো বড়ো। রাসেল জোরে ডাকল– মা। না গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। পাশে তাকাতেই দেখল আরো বড়ো এক সারি ওলা। ওমা এখন তো চারিদিকে ওলা। অসংখ্য অগণিত। রাসেল আব্বাকে ডাকতে চাইল। ভাবিদের ডাকতে চাইল। ভাইদের ডাকতে চাইল। একি তার গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। সামনে তাকিয়ে দেখতে পেলো রাসেল- অদূরে আব্বা, মা, ভাইয়া, ভাবিদের সারা শরীরে অসংখ্য ওলা। হঠাৎ গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে যায় রাসেলের। আবার মুহুর্মুহু গুলির শব্দে ঘুমিয়ে পড়ে রাসেল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখতে পায় অসংখ্য ওলারা ছেয়ে ফেলেছে সারা বাড়ি, সারা পাড়া, সারা দেশ। দিনটি ছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ভোর। ■

প্রতিযোগিতা

মুস্তাফা মাসুদ

ছোটো দাদা ভাই ঢাকা থেকে এসেছেন গতকাল। ছোটো চাচা এবং চাচিও। অথচ অন্য সময়ের মতো এখন পর্যন্ত আমাদের ডাক পড়েনি দাদা ভাইয়ের কাছে। আর ডাক না পড়লে দল বেধে তাকে গল্পের জন্য ছেঁকে ধরতেও সাহস পাই না। দল মানে সাংঘাতিক বিচ্ছুর দল– দুষ্টুর শিরোমণি একেকজন। আমি আর মিন্টু ক্লাস নাইনে পড়ি বলে একটু শান্তশিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু রোমেল, রিপন, বিপ্লব, অরুণ, কান্তা, শান্তা আর ফিরোজ এরা একটু নিচের ক্লাসে পড়ে এবং এদের ডানপিটেমি একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি। তাই ওদের কিছু না বলেই আমি ছোটো চাচুর বড়ো ঘরের পাশে ঘুরঘুর করতে থাকি নিজের মনে। ওই ঘরেরই একটি কামরায় দাদু থাকেন। দাদু হলেন ছোটো চাচুর বাবা– আমার বাবার আপন চাচা। ঢাকায় চাকরি করতেন। এখন অবসরে। ছোটো চাচুও ঢাকায় চাকরি করেন। গতকাল গ্রামের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। প্রতি বছরই দু-একবার আসেন। সাথে থাকেন তার বাবা, মানে আমাদের ছোটো দাদা– গল্পের ঝুড়ি মিষ্টি দাদ ভাই।

ঘরের পাশে আমাকে ঘুরতে দেখে ছোটো চাচি এগিয়ে আসেন। বলেন– এই যে মিন্টু বাবা যে, তা ওখানে কেন– এসো এসো, ঘরে এসো। একটু আগে তোমার দাদা তোমার কথাই বলছিলেন। কাল সন্ধ্যায় বা রাতে আসনি কেন?

আমি চাচির কথার জবাব না দিয়ে সোজা চলে যাই দাদুর ঘরে। গিয়ে দেখি তিনি ঘরে নেই। একটু পরেই দেখি তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন গ্রিল ধরে। চোখ দুটি উদাস, চেয়ে আছেন পুব দিকে। সামান্য দূরেই আমাদের পুকুরটা। অন্তত পঞ্চাশ বছর আগের পুকুর; তবুও কেমন থই থই জলের সমুদ্র যেন– বিকেলের ম্লান রোদে ঝলমল-টলমল করছে। হঠাৎ মনে হলো– দাদুরও দু-চোখ যেন ওই পুকুরের জলের মতো টলমল করছে। আমি তাকে ডাকতে সাহস পাই না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি নীরবে। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে, মনে নেই। হঠাৎ দেখি আমার ডান হাতটি দাদুর মুঠোর মধ্যে। তিনি একটু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– ভাই মিন্টু, মনটা ভালো নেই। তাই তোমাদের ডাকিনি–

– কেন, কেন মন খারাপ, দাদু?

– আগে বলো, এটা কোন মাস?

– কেন, আগস্ট মাস! আজ ৮ই আগস্ট।

– এ মাসের স্মরণীয় ঘটনা কী জানো?

আমি ক্লাস নাইনের ফার্স্ট বয়। দাদুর এ প্রশ্নে আমি সব বুঝতে পারি। কেন তার মন খারাপ, তা বুঝতেও আর বাকি থাকে না। আমারও বুকটা বেদনায় ভারি হয়ে ওঠে। মুখ শুকিয়ে যায়। বলি– দাদু, আপনার মন খারাপের কারণ আমি বুঝতে পেরেছি। এ মাসেই তো বাঙালির মহা শোকের দিন– জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতাকে এ মাসের পনেরো তারিখ ভোররাতে নির্মমভাবে খুন করেছিল একদল দুর্বৃত্ত। তারা জাতির পিতাকে খুন করে দেশটাকে আবার পাকিস্তান বানাতে চেয়েছিল। ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মদানকে তারা ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল।

– খুবই খাঁটি কথা বলেছ, মিন্টু দাদু। কিন্তু ওরা কী তা পেরেছে? পারেনি; তার বদলে নিজেরাই নিকেশ হয়ে গেছে, আর বঙ্গবন্ধু শহিদ হয়েও কোটি মানুষের ভালোবাসায় আজও বেঁচে আছেন। শোনো দাদু, আমার জন্ম তারিখ ১১ই আগস্ট। পঁচাত্তরের পর থেকে কখনো আমি জন্মদিন পালন করি না। কোনো বাঙালিই এ মাসে আনন্দ-ফুর্তি করতে পারে না। তা ভাই, তোমার কথা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। কে বলে, আজকের শিশু-কিশোর-তরুণেরা বঙ্গবন্ধুকে জানে না; দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের খবর রাখে না?

– বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমাদের স্কুলে পড়ানো হয়।

– তা আমি জানি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ক্ষমতায় থাকায় এটি সম্ভব হয়েছে। আসলে, মুক্তিযুদ্ধ হলো আমাদের মুক্তির মন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। আমাদের ভাগ্য আমরাই গড়ছি। কেউ আমাদের ওপর খবরদারি করতে পারে না। আর একটি কথা– শুধু ক্লাসের বই পড়লেই হবে না; বঙ্গবন্ধুকে ভালোভাবে জানতে হলে বাইরের বইও পড়তে হবে। জানো, মহান নেতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শত শত বই লেখা হয়েছে; দুনিয়ার কোনো রাজনৈতিক নেতাকে নিয়ে এত বই লেখা হয়নি।

– অ্যামাজিং! এই তথ্যটি আগে জানা ছিল না। আপনার কাছে শুনে ভারি ভালো লাগছে, দাদু।

আমরা কথা বলছি, এমন সময় বাইরে অনেকগুলো কণ্ঠের কলধ্বনি শোনা যায়। একটু পরেই ওরা হুড়হুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে। দাদু হেসে বলেন– এই যে, আমাদের বিচ্ছুবাহিনি এসে পড়েছে। এসো, এসো সবাই। তবে আজ আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে–

– প্ল্যান? কী প্ল্যান? কীসের প্ল্যান, দাদু? সবাই যেন দাদুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। দাদু একটু গম্ভীরভাবে বলেন– কমপিটিশন, মানে প্রতিযোগিতা।

– প্রতিযোগিতা? কীসের প্রতিযোগিতা? কোথায় প্রতিযোগিতা, দাদু?

– বঙ্গবন্ধুকে জানার প্রতিযোগিতা। এটি আগস্ট মাস– বঙ্গবন্ধুর রক্তে রাঙা আগস্ট মাস। আমি জানি, স্কুলের পাঠ্য বইয়ে তোমরা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে পড়ে থাকো। তাই মনে করো, আমি তোমাদের একটু পরীক্ষা করে দেখছি কতটা জানো তোমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে। কারণ, বঙ্গবন্ধুকে ভালোভাবে জানা আমাদের কর্তব্য। বঙ্গবন্ধুকে না জানলে বাংলাদেশকে জানা হবে না। আর বাংলাদেশকে না জানলে তাকে ভালোবাসাও যাবে না। কোনো বাঙালির পক্ষে সেটা কী সম্ভব?

আমি এবার কথা বলি– এই যে শোনো তোমরা– বিচ্ছুবাহিনির প্রিয় বিচ্ছুরা, আমরা অবশ্যই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেব। দাদু, বলুন কীভাবে প্রতিযোগিতা হবে, কখন হবে?

– আগামী পরশু, মানে ১০ই আগস্ট। এর মধ্যে তোমরা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরো পড়াশোনা করো। বড়োদেরও সাহায্য নাও, কেমন? ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের আমি পুরস্কার দেবো। এখন সবাই যার যার বাড়ি যাও। আর ভাই মিন্টু, তুমিও যাও।

সবাই যাওয়ার জন্য ওঠে। কিন্তু ওঠে না ফিরোজ, আমতা আমতা করে কী যেন বলতে চায়। দাদু মৃদু হেসে বলেন– তুমি কিছু বলবে, ফিরোজ? বলো, ভয় কীসের?

– আমার আব্বা তো বঙ্গবন্ধুকে একদম পছন্দ করে না, তার নামটা পর্যন্ত শুনতে পারে না। আব্বা বলেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নাকি গোলমাল ছিল। কিন্তু আমি তো আমার বইয়ে অন্যরকম পড়েছি। তাই আমার আব্বার কাছে কিছু বলা যাবে না, সাহায্য তো নেওয়া যাবেই না। তবে সমস্যা নেই। স্কুল লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক বই আছে; আমি ওগুলোর সাহায্য নেব।

ফিরোজের কথায় দাদু অবাক হন না। তিনি ভালোমতোই জানেন– কিছু লোক এখনো আছে, যারা পাকিস্তান প্রেম ছাড়তে পারে না। এরাই বঙ্গবন্ধুকে অপছন্দ করে। কারণ, বঙ্গবন্ধুর জন্যই যে তাদের সাধের পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে! দাদু ফিরোজকে বলেন, ডিয়ার দাদু, তোমার আব্বার মতো মানুষদের নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। আমার চিন্তায় শুধু তোমরা– এই কচিকাঁচারা। তোমরাই তো আগামী দিনের বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।

১০ই আগস্ট। দাদুদের বাইরের ঘরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে সোফাসেট, চেয়ার, টুল আছে। একটা বেঞ্চিও পাতা আছে। আমরা যে যার মতো বসে পড়লাম। সবার হাতে খাতা-কলম। এ সময় দাদু এলেন। তার হাতে একটা কাগজ, তাতে কী সব যেন লেখা– বোঝা যায় না। দাদু এসেই বললেন– পরীক্ষা, মানে প্রতিযোগিতা হবে মৌখিক। আমি মুখে মুখে প্রশ্ন করব; আর তোমরা উত্তর দেবে। নো খাতা-কলম, নো লেখালেখি। যার সঠিক উত্তরের সংখ্যা বেশি হবে, সে-ই হবে প্রথম। তার পরের জন দ্বিতীয়, তার পরের জন তৃতীয়– এভাবে মোট তিনজনকে এক সেট করে বই পুরস্কার দেওয়া হবে। আর এ পুরস্কারের নাম হবে– 'বঙ্গবন্ধু জ্ঞান প্রতিযোগিতা পুরস্কার'। তবে...

তবে? আমি প্রশ্ন করি। দাদু বলেন– তবের উত্তর হলো: মিন্টু এই প্রতিযোগিতা থেকে বাদ। ও বেশ উপরের ক্লাসে পড়ে। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানেও অনেক। ওর সাথে তোমরা পেরে উঠবে না, তাই ও বাদ।

বিচ্ছুদের মধ্যে বেশ খুশির ভাব দেখা যায় আমি বাদ যাচ্ছি বলে। আমি দাদুর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। দাদু কাগজখানা আমার হাতে দিয়ে বলেন– মিন্টু, ওদের এক-এক করে প্রশ্ন করে যাও, ওরা উত্তর দিক আর আমি শুনি। তারমানে তুমি হলে এই প্রতিযোগিতার পরিচালক আর আমি একমাত্র বিচারক।

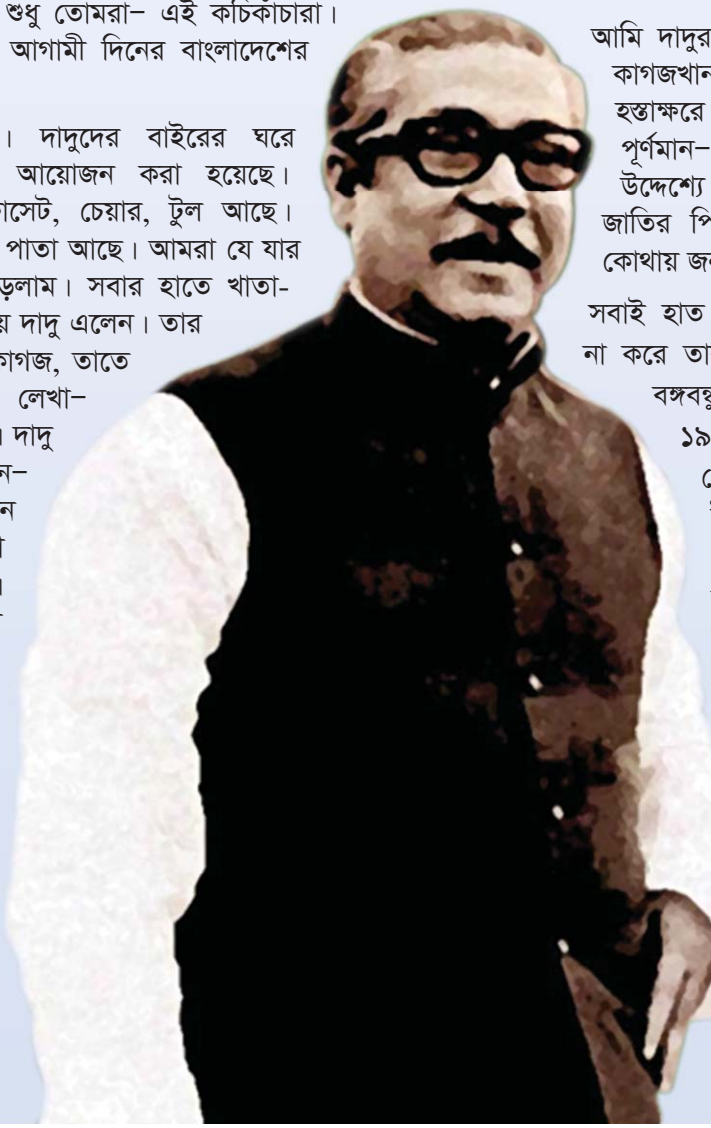

আমি দাদুর হাত থেকে প্রশ্ন লেখা কাগজখানা নিই। গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লেখা মোট পাঁচটি প্রশ্ন, পূর্ণমান–১০০। আমি সবার উদ্দেশ্যে বলি– প্রথম প্রশ্ন হলো: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

সবাই হাত তোলে। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তারা বলে– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ওদের মিলিত জবাবে কেমন একটা শব্দজট তৈরি হলো। তবু দাদু ভারি খুশি হন, বলেন– ঠিক হয়েছে, একদম ঠিক হয়েছে, দাদুরা! সবাইকে ২০ নম্বর করে দিলাম। নেক্সট–

আমি বলি– এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো: বঙ্গবন্ধুর ডাকনাম কী? তাঁর বাবা-মায়ের নাম কী? তিনি কবে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব পান?

এবারও সবাই একযোগে হাত তোলে, তারপর বলে– বঙ্গবন্ধুর ডাকনাম খোকা; আর তাঁর বাবা-মায়ের নাম: শেখ লুৎফর রহমান ও শেখ সায়েরা খাতুন। তিনি বঙ্গবন্ধু খেতাব পান ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি।

– ভেরি গুড! এবারও প্রত্যেকে ২০ নম্বর পাবে, দাদু উৎসাহের সাথে বলেন। আমি বলি– এবার তোমাদের জন্য তৃতীয় প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধুর পূর্বপুরুষ ছিলেন একজন কামেল দরবেশ। তাঁর নাম কী?

এবার মাত্র একটি হাত উঠল, সে হাতটি শান্তার। শান্তা ক্লাস এইটের ফার্স্ট গার্ল। সে বলে– তাঁর নাম শেখ আউয়াল। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাগদাদ থেকে তিনি এদেশে এসেছিলেন। তাঁরই বংশধরেরা পরবর্তীতে টুঙ্গিপাড়া এলাকায় বসতি স্থাপন করেন।

– বাঃ বাঃ আপু, খুবই চমৎকার বলেছ! এবার তুমি একাই পুরো ২০ নম্বর পেলে। দাদু আবেগ-জড়ানো গলায় বলেন। আমি এবার চতুর্থ প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিই ওদের উদ্দেশ্যে: বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ থেকে অন্তত ৫টি লাইন মুখস্থ বলতে হবে, কে কে পারবে?

এবার কারো হাত ওঠে না, তবে সমবেত গুঞ্জন শুরু হয়, যার অর্থ– ৫টি না পারলেও কয়েকটি তো পারি। তখন দাদু বলেন– ঠিক আছে। যে যে কয় লাইন পারো বলো। সেভাবেই নম্বর পাবে। এবার শুরু করো।

প্রথমেই শুরু করে রিপন- 'তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। মরতে যখন শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না...'

'মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।'

'এবারের সংগ্রাম– আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম– স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।...'

এভাবে সবাই বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ থেকে একাধিক লাইন বলে গেল। দাদু এতেই খুশি। খুশির চোটে বলেই ফেললেন: উত্তর আংশিক হলেও আমি তোমাদের ওপর বড্ড খুশি হয়েছি। তাই সবাইকেই পুরো নম্বর দিয়ে দিলাম। আর থাকল একটি প্রশ্ন। মিন্টু, শুরু করো।

আমি আমার হাতে ধরা প্রশ্নপত্রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলি– কে, কখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?

– এ তো একেবারে পানির মতো সোজা। পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সবাই একসাথে বলে। আবারও শব্দজট তৈরি হয়, তবে তাতে দাদুর খুশি বাড়ে বৈ কমে না। এরিমধ্যে দাদুকে অবাক করে দিয়ে শান্তা বলে– এটি একেবারে সোজা প্রশ্ন; এর জন্য কোনো নম্বর আমরা চাই না। আপনি আরেকটি প্রশ্ন করুন দাদু– একটু যেন কঠিন হয়। বলেই হাসিমুখে আমার দিকে একবার তাকায়। অন্যরাও শান্তার কথা মেনে নেয়।

এবার দাদু বলেন– ঠিক আছে, ঠিক আছে– তাই করছি। বলতে হবে– বঙ্গবন্ধুকে কেন জাতির পিতা বলা হয়?

– তিনি আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন তাই।

– তিনি বাঙালিকে বিশ্বসভায় স্থান দিয়েছেন, তাই।

এভাবে চলতে থাকে একের পর এক। দাদু সবাইকে থামান। বলেন– তোমাদের সবার বক্তব্যে সত্যতা আছে, কিন্তু আরেকটু খোলসা হওয়া চাই। বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তিনি বাঙালিকে বিশ্ব সভায় স্থান করে দিয়েছেন– সবই সত্য; সেই সাথে তিনি হাজার বছরের একটি অবহেলিত জাতিকে একটি আলাদা পরিচয়ে– গর্বিত বাঙালি পরিচয়ে চিহ্নিত করেছেন। তিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেই ক্ষান্ত হননি; তেইশটি বছর লড়াই করেছেন পাকিস্তান ঔপনিবেশিক অপশক্তির বিরুদ্ধে। সেই লড়াইয়ে গোটা জাতিকে একতাবদ্ধ করেছেন; পরিণামে রক্তাক্ত এক মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা লাভ করি স্বাধীনতা, লাভ করি একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র– বালাদেশ। একটি নতুন স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের স্রষ্টা হিসেবেই বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা বলা হয়।

এ পর্যন্ত বলে দাদু একটু থামেন, তারপর বলেন– এখন আমি একটি ঘোষণা দিতে চাই: এই প্রতিযোগিতায় আমি তোমাদের সবাইকেই চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করলাম। সবাইকেই প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে। বলো সবাই: জয় বাংলা!

– জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু! বাংলাদেশ চিরজীবী হোক!

এক অপরূপ মনভোলানো জয়ধ্বনিতে বৈঠকখানাটি টইটম্বুর হয়ে ওঠে। ■

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন
উপলক্ষ্যে ধারাবাহিক

একাত্তরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা

লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির

শহিদ জাকির হোসেন বীরপ্রতীক

আবদুল করিম ও পরি বানুর চার ছেলে আর দুই মেয়ের মধ্যে সবার বড়ো জাকির হোসেন গোপীবাগের রামকৃষ্ণ মিশন রোডের ৪২ নম্বর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। লাহোর ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন রাজনৈতিক অসন্তোষের কারণে তিনি ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন।

সৈনিক জীবনের প্রতি জাকিরের খুব আগ্রহ থাকলেও তৎকালে স্বল্পসংখ্যক বাঙালি তরুণ সেনাবাহিনীতে নিয়োগের সুযোগ পেতেন বলে তাঁর সুযোগ হয়নি।

রাজনৈতিকভাবে ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) ভাসানীর কর্মী জাকির লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরেই নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ২৫শে মার্চের গণহত্যা প্রতিরোধের জন্য তিনি ও তাঁর সহযোগীরা পুলিশ এবং অন্যান্য বাহিনী থেকে প্রাপ্ত কিছু সংখ্যক হাতিয়ার নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ রচনার চেষ্টা করেন। তা ছাড়া তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গতিবিধি ও অবস্থানের তথ্য গোপনে মুক্তিবাহিনীকে পৌঁছে দিতেন। ধীরে ধীরে তিনি গেরিলা যোদ্ধার কৌশল আয়ত্ত করেন এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানে যেমন: নয়াবাজার ও মালিবাগের অপারেশনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি এটাও বুঝলেন যে, এই ধরনের ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত অপারেশন চালিয়ে বিশাল ও শক্তিশালী বাহিনীর মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। এজন্য প্রয়োজন আরো প্রশিক্ষণ ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। তাই তিনি প্রশিক্ষণ নিতে ভারত গমনের সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে জাকির ২ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর ভারতের মেঘালয় শিবিরে উপস্থিত হন এবং সেখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শেষে সম্মুখসমরে অংশগ্রহণের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁকে ১২ নম্বর প্লাটুনের অধিনায়ক নিয়োজিত করে সালদা নদীর প্রতিরক্ষা অবস্থানে নিয়োগ করেন। জাকির তাঁর প্লাটুন নিয়ে সালদা নদী এলাকায় হামিদ মাস্টারের বাড়িতে শিবির স্থাপন করেন। একই এলাকায় শিবির স্থাপন করেছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৪ নম্বর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অভিজ্ঞ সৈনিক নায়েব সুবেদার

পাটোয়ারি ও নায়েব সুবেদার বেলায়েত হোসেন। তাঁদের অবস্থানের আরেক পাশে মন্দভাগ বাজারে অবস্থান নিয়েছিলেন একই রেজিমেন্টের সুবেদার ওহাব ও তাঁর সহযোদ্ধারা।

তখন ছিল জুলাই মাস, বর্ষাকাল। চারদিকে অথই পানি। জাকির তাঁর প্লাটুন নিয়ে পানিতে টইটম্বুর সালদা নদীর অপর পাড়ে অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করেন। সেইসঙ্গে তাঁর দল নিয়ে তিনি এই এলাকায় সুবেদার ওহাবের দলকে বিভিন্ন অপারেশনে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেন। আগস্ট মাসের প্রথম থেকে জাকিরের প্লাটুন ও সুবেদার পাটোয়ারির দল মন্দভাগ রেল স্টেশনটি মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

২ নম্বর সেক্টরের ভয়াবহ যুদ্ধের স্থান ছিল সালদা নদী এলাকায়। মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক পরিকল্পনা করেন যে, তাঁরা সালদা নদী অতিক্রম করে অপর পাড়ে পাকিস্তানি সেনা ছাউনি আক্রমণ করবেন। আর সেভাবেই প্রস্তুতি নিতে থাকেন জাকির ও তাঁর সহযোদ্ধারা। কেননা এই ছাউনি দখল করতে পারলে পুরো কসবা থেকে মন্দভাগ রেল স্টেশন ও নদীপথে সালদা নদী ক্রস পয়েন্ট থেকে মন্দভাগ পর্যন্ত বিশাল এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণের দিন নির্ধারণ করা হলো ২৬শে আগস্ট ভোররাত। সিদ্ধান্ত হয় যে, জাকিরের সহযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাছাউনির উত্তরপশ্চিম দিক থেকে আর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করবেন এবং মিত্র বাহিনীর আর্টিলারি উত্তর দিক থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থানের উপরে গোলা বর্ষণ করবে। সেই রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে অপারেশন চালাতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে বলে জাকিরের কয়েকজন সহযোদ্ধা অভিমত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু অধিনায়ক জাকির দৃঢ়স্বরে বললেন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে গোপনে আক্রমণ রচনা করলে বিজয় ছিনিয়ে আনা যাবে।

২৬শে আগস্ট ভোর ৪টার দিকে জাকির তাঁর দলের সামনে থেকে বুক সমান পানির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রচণ্ড বৃষ্টির সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী

মুক্তিবাহিনীর এরূপ ত্রিমুখী আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অতর্কিত আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রায় পর্যুদস্ত করে ফেলেন জাকির ও তাঁর সহযোদ্ধারা। কয়েক গজ দূরের শত্রুপক্ষের মাত্র একটি লাইট মেশিনগান (এলএমজি) পোস্ট দখলের বাকি ছিল। সেই এলএমজি থেকে ক্রমাগত গুলি বর্ষিত হচ্ছিল বলে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ ব্যাহত হচ্ছিল।

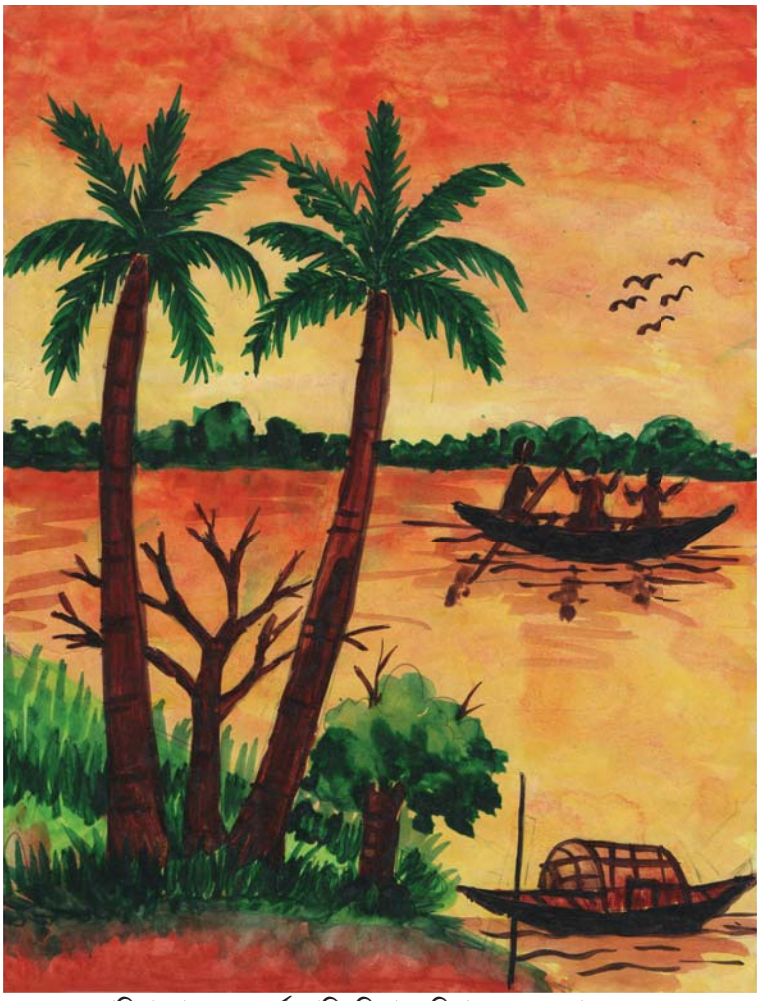

মালিহা আনজুম, চতুর্থ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জাকিরের নির্দেশে সহযোদ্ধা মোস্তাক ক্রলিং করে এলএমজি পোস্টের কাছে গিয়ে একটি গ্রেনেড ছুঁড়লেন। কিন্তু তখনই মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাক চোয়ালে আর ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় বার বার জাকিরের নাম ধরে ডাকছিলেন। তাঁর অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে জাকির দ্রুত ধানক্ষেতের আইলের পাশ দিয়ে ক্রলিং করে মোস্তাকের কাছে পৌঁছেন। তখন চারদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলি ও চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। কালক্ষেপণ না করে তিনি মোস্তাকের দেহ তাঁর পিঠে তুলে নেন এবং নিজের অস্ত্র নিয়ে দ্রুত নিরাপদ অবস্থানে আসার সময় শত্রুপক্ষের এক ঝাঁক গুলি জাকিরের মাথা আর বুক ভেদ করে। সহযোদ্ধাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে জাকির হোসেন নিজেই শহিদ হলেন। মুক্তিবাহিনীর এই প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পশ্চাদপসরণ করে এবং সূর্য ওঠার পর পরই মুক্তিবাহিনী এলাকাটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

এই বিজয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আনন্দিত হলেও শহিদ জাকিরের মৃতদেহ দেখে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন তাঁরা। মন্দভাগ গ্রামের গ্রামবাসীরাও দলে দলে এসে শহিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। সেক্টর অধিনায়কের নির্দেশে শহিদ জাকিরের প্রশিক্ষক শহিদের জন্য গার্ড অব অনারের বন্দোবস্ত করেন। নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে অবস্থিত নিকটবর্তী কোল্লাপাথরে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থলে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনকারী এই বীরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মরণোত্তর 'বীরপ্রতীক' খেতাবে ভূষিত করা হয়। (দি বাংলাদেশ গেজেট, এক্সট্রাঅর্ডিনারি পাবলিশড্ বাই অথরিটি, শনিবার, ডিসেম্বর ১৫, ১৯৭৩, নোটিফিকেশন নম্বর ৮/২৫/ডি-আই/৭২-১৩৭৮-১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩, ক্রমিক নম্বর ৩১২)। ■

গল্প

রাজকুমারী রিমঝিম

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

অনেক বছর আগের কথা। গভীর সাগরে ছিল এক বিশাল বড়ো দ্বীপ। সেই দ্বীপের এক রাজ্যের নাম ছিল চন্দনশীলা। চন্দনশীলা রাজ্যের রাজা ছিলেন খুব ভোগবিলাসী। তার ভোগবিলাসের জন্য এমন কোনো কাজ ছিল না যে তিনি করতেন না। এজন্য প্রজাদেরকে নির্যাতন করা হতো। প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করা হতো কড়ায়গণ্ডায়। ব্যতিক্রম হলেই শুরু হতো নিষ্ঠুর নির্যাতন।

চন্দনশীলা রাজ্যের রাজার ছিল এক কন্যা। নাম ছিল রিমঝিম। রিমঝিমের জন্মের সময়ই রানিমা মারা যান। রিমঝিমের ভাগ্যে জুটে না মাকে দেখার। মায়ের আদর পাওয়ার। তবে তার বড়ো হওয়ার জন্য কোনো সমস্যা হয়নি। রাজকুমারী বড়ো হতে থাকে দাসদাসীর সেবাযত্নে। সেবাযত্নে এতটুকু ত্রুটি হয়নি। হবে কী করে? যেই বড়ো রাজপ্রাসাদ ছিল তার বর্ণনা দেওয়াও কঠিন। সেই প্রাসাদে ছিল এক হাজার একটি দুয়ার। আর সেই প্রাসাদের দাসদাসীর সংখ্যাও এক হাজার একজন। এমন রাজপ্রাসাদে দাসদাসীদের আদরে বড়ো হতে লাগল রিমঝিম। তার চাওয়া-পাওয়ার কোনো ত্রুটি ছিল না। আর রাজার হুকুমও ছিল যাতে রাজকুমারীর যত্নের কোনো ত্রুটি না হয়। রিমঝিম ছিল রাজার প্রাণের টুকরো।

রাজাও রিমঝিমকে খুব আদর করতেন। সন্ধ্যার পরে রাজা নিজের ঘরে যাওয়ার পর রিমঝিম বাবার সঙ্গে সময় কাটাত। বাবার আদরেরও শেষ ছিল না। রাজকুমারী যখন খিলখিল করে হাসত তখন রাজার মনও আনন্দে ভরে যেত। এ তো গেল নিজ প্রাসাদের কথা। রাজা রিমঝিমকে নিয়ে অনেক সময় হাতিতে চড়ে বাইরেও বেড়াতে যেতেন। রিমঝিমের ইচ্ছেমতো রাজা তাকে নিয়ে বেড়াতেন।

রিমঝিমের বয়স যখন বারো বছর তখন তার ইচ্ছেমতোই চলাফেরা, খাওয়াদাওয়া, লেখাপড়া সবই হতো। রাজাও কোনো সময় বাধা দিতেন না। রিমঝিম নিজের মতো করে নিজেকে গড়ে তুলতে লাগল।

রিমঝিম যখন নিজেকে বুঝতে শিখল তখনই নানারকম চিন্তায় ডুবে যায়। কোথায় যেন অশান্তি! রাজপ্রাসাদে সে যেন শান্তি পায় না। এত বড়ো প্রাসাদে এত আদরযত্নে বড়ো হলেও সেই সুখ তার ভালো লাগে না। ওর কেবল মনে হতো রাজপ্রাসাদের এত ধনদৌলত যা সঞ্চয় করা হয়েছে তা মানুষের কাছ থেকে কেড়ে আনা হয়। আর যখন মন খারাপ হতো তখন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যেত বাগানে অথবা ঘোড়ায় চড়ে দূরদূরান্তে।

একদিন রাজকুমারী রিমঝিম ছদ্মবেশে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল অনেক দূরের গ্রামাঞ্চলে। সেখানে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল রাজার সৈন্যরা প্রজাদেরকে চাবুক মারছে। প্রজারা অনেক আকুতি-মিনতি করার পরও সৈন্যরা তাদেরকে প্রহার করে চলল। তাদের কান্নায় বাতাস ভারি হয়ে উঠল। খাজনার জন্য তাদেরকে এমনভাবে প্রহার করা হচ্ছিল।

এই দৃশ্য দেখে রাজকুমারী রিমঝিম স্থির থাকতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যেই তার জেদ চেপে গেল। সে সৈন্যদের হাত থেকে চাবুক ছিনিয়ে নিয়ে সৈন্যদেরকে বেদম প্রহার করতে শুরু করল। হঠাৎ এমন অতর্কিত আক্রমণে সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে প্রাণে বাঁচল।

সেখান থেকে ফিরে রিমঝিম বিষণ্ন মনে রাজপ্রাসাদের বাগানের একটি গাছের নিচে গিয়ে বসল। রাজপ্রাসাদের পাশের বাগানটিও ছিল বিশাল বড়ো। বাগানের এক পাশে দাঁড়ালে অন্যপাশ দেখা যেত না। সেখানে ছিল নানারকমের ফুল ও ফলের গাছ। কত সুন্দর সুন্দর পাখি বাগানে আসে! পাখির কাকলিতে বাগানটি মুখরিত থাকত। অন্যদিন রাজকুমারী বাগানে এলে পাখিরা গান গাইত। প্রজাপতিরা তার চারপাশে নেচে নেচে আনন্দ করত। রাজকুমারী রিমঝিমও প্রজাপতিদের সঙ্গে খেলত। তখন ফুলেরাও সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে বাগান মোহিত করত।

আজকে রাজকুমারী রিমঝিমের এমন মলিন মুখ দেখে একটি সুন্দর পাখি কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আজ তুমি গান শুনবে না?

রিমঝিম উত্তর দিলো, না, গান শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

প্রজাপতি এসে বলল, আজকে আমাদের সঙ্গে খেলবে না?

রিমঝিম উত্তর দিলো, আজকে আমার খেলতে ইচ্ছে করছে না।

একটি ফুল বলল, আজকে আমাদের সুবাস নিবে না?

রিমঝিম উত্তর দিলো, আমার সুবাস নিতে ইচ্ছে করছে না।

রাজকুমারীর মন খারাপ দেখে বাগানের সবারই মন খারাপ হলো। এই সময় বাগানের একটি সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে একজন অদ্ভুত লোক এসে রাজকুমারী রিমঝিমের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, কী হয়েছে রাজকুমারী? তোমার মন খারাপ কেন?

রাজকন্যা তাকিয়ে দেখে তার হাতে সুন্দর সোনার ছোটো লাঠি। অদ্ভুত ভালো লাগার মতো। লাঠির মাঝখানে ছয়টি ফুটো। রাজকুমারী জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

অদ্ভুত লোকটি বলল, আমি জাদুকর।

তোমার হাতে এটা কী?

এর নাম বাঁশি।

তখন পৃথিবীর কোথাও বাঁশি ছিল না। রাজকুমারী রিমঝিম কী করে চিনবে এটি যে বাঁশি!

জাদুকর জানতে চাইল, কেন তোমার মন খারাপ, রাজকুমারী?

রাজকুমারী রিমঝিম বলল, দেশের প্রজারা কত কষ্টে থাকে আর আমরা এত সুখে থাকি। তাদের ধনসম্পদ

আমরা কেড়ে নিয়ে এত আরাম-আয়েশ করি, এর কোনো মানে হয় বলো? এ কারণেই আমার মন খারাপ।

জাদুকর বলল, এটাই পৃথিবীর নিয়ম। যাদের ক্ষমতা আছে তারা অন্যদের ধনদৌলত কেড়ে নেয়। এসব ভেবে তোমার মন খারাপ করা উচিত নয়।

আমি কী করব? আমার মন যে খারাপ হয়। আমি যে দুঃখী মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারি না। আর আমার বাবাই যদি মানুষকে কষ্ট দেয় তাহলে কী করে সহ্য করব, তুমিই বলো জাদুকর।

জাদুকর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, আমার বলার কিছু নেই। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। তবে তুমি যদি চাও তোমার মন ভালো করে দিতে পারি।

কীভাবে?

আমার বাঁশির সুর শুনলে তোমার মন ভালো হয়ে যাবে।

তাহলে শোনাও তোমার বাঁশির সুর।

জাদুকর বাঁশিতে সুর তুলল। এ সুর এমনই এক সুর যে, এক মুহূর্তে রাজকুমারী রিমঝিমের মনের সব কষ্ট যেন সুরের সঙ্গে মিশে বাতাসে ভেসে গেল। গাছের পাখিরা চলে এল পাশে। ওরা গান গাইতে লাগল। প্রজাপতি চলে এল গানের সুর শুনে। ফুলের সুবাসে বাগান ভরে গেল।

রাজকুমারী আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, তোমার বাঁশিটি কি আমাকে দেবে?

জাদুকর বলল, এ বাঁশি তোমাকে দিতে পারব না রাজকুমারী। এটি দিলে তোমার অমঙ্গল হবে।

রিমঝিম খুব অবাক হয়ে বলল, কেন? কেন অমঙ্গল হবে?

জাদুকর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে কথা বলা যাবে না রাজকুমারী।

কিন্তু রাজকুমারী রিমঝিম বড্ড জেদ করল। তাই জাদুকর বাধ্য হলো বাঁশিটি তাকে দিতে।

রাজকুমারী রিমঝিম বাঁশিটি নিয়ে নিজের কাছে রাখল খুব যত্ন করে।

একদিন রাজকুমারী ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক দূরে গেল বেড়াতে। সেখানে গিয়ে রাজকুমারী হতবাক হয়ে গেল। একটি গ্রামের বাড়িঘর আগুনে পুড়ছে আর দূরে দাঁড়িয়ে শত শত মানুষ হাউমাউ করে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। রাজকুমারী রিমঝিম জিজ্ঞেস করল, তোমাদের গ্রামে আগুন লাগল কীভাবে?

গ্রামবাসী বলল, আমাদের খাজনা বাকি বলে রাজার লোকেরা গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। আমাদেরকে নিঃস্ব করে দিয়ে গেল সৈন্যরা।

গ্রামবাসীর এমন করুণ অবস্থা দেখে আর তাদের কষ্টের কথা শুনে রাজকুমারীর মন বড়ো ব্যথিত হলো। সে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেল। আর নিজের মন ভালো করার জন্য লুকিয়ে রাখা বাঁশিটি বের করে বাজাতে শুরু করল। এই সময় প্রাসাদের আশপাশের গাছ থেকে পাখিরা গান গাইতে শুরু করল। প্রজাপতিরা নাচতে শুরু করল। রিমঝিমের মনে হলো চারপাশে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

রাজকুমারী এমন আনন্দে যখন ডুবে গেল তখন কিন্তু অন্য একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেল।

রাজদরবারে পরিষদ নিয়ে রাজা তখন সভা করছিলেন। বাঁশির সুর রাজদরবারেও ভেসে গেল। রাজদরবারের একজন ছাড়া আর কেউ কিন্তু সেই মধুর সুর শুনতে পেল না। তারা শুনতে পেল আকাশ কাঁপানো বজ্রপাতের শব্দ। তাদের কান যেন ফেটে যাবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো। আর রাজা অস্থির হয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, মেঘমুক্ত আকাশে বজ্রপাত হচ্ছে কেন? রাজা ভয়ার্ত হয়ে দু-হাতে দু-কান চেপে ধরে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। এই অবস্থা কি শুধু একা রাজার হলো? না। পরিষদের সবাই ভয়ে চিৎকার করতে করতে দু-হাতে দু-কান চেপে মেঝেতে শুয়ে পড়ল। তবে একজন ছাড়া। রাজদরবারের এক কবি মধুর সুর শুনে আনন্দে নাচতে শুরু করল।

এদিকে বাঁশি বাজিয়ে রাজকন্যার মন ভালো হওয়ার পর সুর থামিয়ে দিলো। আর রাজদরবারেও আগের মতো সব স্বাভাবিক হলো। কিন্তু সবার মনে একটিই প্রশ্ন, কেউ শুনল বজ্রপাত আর কেউ শুনল মধুর সুর। এমন আজব ঘটনার রহস্য কী? এই রহস্য উদ্ধার করতেই হবে।

কবির নাচের কারণেই বিপদটা আরো বেশি হয়ে গেল। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করল, আমরা শুনছি

বজ্রপাত আর তুমি কিনা আনন্দে নাচলে! তোমার এত দুঃসাহস হলো কী করে? তোমাকে জবাব দিতে হবে। না-হয় তোমার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

রাজার হুকুম পেয়ে কবি বললেন, কী যে মধুর সুর শুনলাম তা আপনাদেরকে বোঝাতে পারব না, মহাশয়। এমন মধুর সুর আমার জন্মের পর কোনো দিন শুনিনি। সত্যি কথা হলো আমি কোনো বজ্রপাতের শব্দই শুনিনি।

রাজা এই রহস্য উদঘাটনের জন্য রাজ্যের সেরা জ্যোতিষীকে ডেকে পাঠালেন। জ্যোতিষী অনেক চেষ্টা করে রহস্য উদঘাটন করলেন। তিনি বললেন, রাজকন্যার কাছে একটি বাঁশি আছে যে বাঁশি বাজালে এমন ঘটনা ঘটে।

জ্যোতিষীর কথা শুনে রাজা তখনই রাজকুমারী রিমঝিমকে রাজদরবারে বাঁশিসহ হাজির করতে প্রহরীকে হুকুম করলেন। রাজকুমারী রিমঝিম বাঁশি নিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হলে রাজা হুকুম করলেন, বাঁশি বাজাও।

রাজকুমারী রিমঝিম যখনই বাঁশিতে সুর তুলল তখনই আগের মতো অবস্থার সৃষ্টি হলো। বজ্রপাতের ভয়ানক শব্দ হতে লাগল। আর কবি শুনতে লাগল সুমধুর সুর।

এই অবস্থার জন্য রাজকুমারী রিমঝিমের ভাগ্যে নেমে এল কঠিন দুঃসময়।

রাজা জ্যোতিষীকে হুকুম করলেন, বাঁশির সুরের এই রহস্য উদঘাটন করো। কেন এমন হয়?

জ্যোতিষী রহস্য উদঘাটন করে বলল, বাঁশির সুরের রহস্যের কথা বললে আমার গর্দান যাবে হুজুর। আমাকে মাফ করবেন এ কথা আমি বলতে পারব না। আর যদি নির্ভয়ে বলতে বলেন তাহলে বলতে পারি।

রাজা বললেন, তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো। আমি কথা দিলাম, তোমার গর্দান নেওয়া হবে না।

জ্যোতিষী বলল, এই সুর তাদের মনেই আনন্দ দেয় যারা মানুষের মঙ্গল চায়, শান্তি চায়, অত্যাচার করে না। আর তাদের কানেই বজ্রপাতের মতো বাজে যারা অত্যাচারী আর নিজের ভোগবিলাস ও আনন্দের জন্য মানুষের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করে।

জ্যোতিষীর কথা শোনার পরেই রাজা রেগে আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন, রাজকুমারীকে বন্দি করো। জ্যোতিষীর গর্দান নাও। সে কিনা বলে আমি অত্যাচারী।

রাজদণ্ড মুহূর্তের মধ্যেই কার্যকর হলো। রাগের মাথায় রাজকুমারী রিমঝিমকে কারাবাস দেওয়ার পর রাজার মন বড়ো অশান্ত হয়ে পড়ল। রাজা কষ্টে জর্জরিত হতে লাগলেন। এমন মা-মরা মেয়েটাকে এত নির্মম শাস্তি দিলেন। তিনি প্রতিনিয়তই অশান্তির

আগুনে পুড়তে লাগলেন। রাজা এই আদেশ আবার মওকুফ করতে পারছেন না। কারণ, সে দেশের আইন অনুযায়ী একবার কাউকে সাজা দেওয়া হলে তা বাতিল করা সম্ভব নয়। রাজা যদি বাতিল করেন তাহলে রাজাকেই সেই সাজা ভোগ করতে হবে। রাজকুমারীকে এমন সাজা দিয়ে রাজা নিজেও মনের কষ্টে পুড়তে লাগলেন। তিনি রাজকর্ম ফেলে প্রায় সময়ই নদীর ধারে মন খারাপ করে বসে থাকতেন।

একদিন সেই জাদুকর খবর পেল রাজকন্যা কারাগারে আছে। জাদুকর মনে মনে নিদারুণ কষ্ট অনুভব করল। রাজকন্যার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলে জাদু বলে সমস্ত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে রাজকন্যার কারাকক্ষে গিয়ে হাজির হলো জাদুকর। রাজকন্যা রিমঝিম তাকে দেখেই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী করে এখানে এলে?

জাদুকর কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু মুচকি হাসল।

রাজকন্যা এই কয়দিনে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। শরীর রোগা হয়ে গেছে। মনে হয় সে বাঁচবে না। জাদুকর বেদনাহত হয়ে বলল, রাজকন্যা আমি আগেই বলেছিলাম তোমার বড়ো অমঙ্গল হবে। কেন সেদিন জেদ করেছিল? এমন না করলে কি বাঁশিটি দিতাম?

রাজকুমারী স্বাভাবিকভাবেই বলল, তাতে আমার কোনো সমস্যা হয়েছে বলে হয় না। তবু অত্যাচারী মানুষগুলো বুঝুক যে তারা অত্যাচারী। এখন আমি চাই এই বাঁশি রাজ্যের সর্বত্র বাজুক। অত্যাচারী মানুষগুলো নিঃশেষ হয়ে যাক বজ্রপাতের কঠিন আওয়াজে।

জাদুকর বলল, এটা সম্ভব নয় রাজকন্যা। আমার অপরাধ মাফ করবে, তুমি যদি হুকুম করো তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সেই বাঁশি আর বাজবে না। যদি বাজে তবে দেশের মানুষের আরো অমঙ্গল হবে।

রাজকন্যা বলল, না, আমি এখানেই থাকতে চাই। রাজার হুকুম পালন করে যদি আমি মরেও যাই তাতে আপত্তি নেই। মরে গিয়েও এক অত্যাচারী বাবার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারলাম, এটাই আমার শান্তি।

জাদুকর কোনো উপায় না দেখে সেখান থেকে বের হয়ে নদীর তীর ধরে হাঁটতে শুরু করল। অনেক দূর যাওয়ার পর দেখল রাজা একটি ছাতিম গাছের নিচে বসে কাঁদছেন। জাদুকর জিজ্ঞেস করল, মহারাজ অপরাধ মাফ করবেন, আপনার মনে কীসের দুঃখ? আপনি কাঁদছেন কেন?

রাজা বললেন, সে কথা শুনে তোমার কোনো লাভ নেই।

লাভ তো হতেও পারে। আপনি বলুন মনের কথা। জাদুকরের পীড়াপীড়িতে রাজা সব ঘটনা খুলে বলল। তারপর বলল, তুমি কি আমার মনের দুঃখ দূর করে দিতে পারো। আমার কন্যার জন্য কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়। কিন্তু আমি কিছুই করতে পারছি না। এমনকি তাকে এক নজর দেখতেও পারছি না। তুমিই বলো কী করব?

জাদুকর চিন্তা করে দেখল পৃথিবীর সর্বত্র এমনই হবে। কেউ অত্যাচারী, কেউ অত্যাচারিত। কেউ খুশি আর কেউ দুঃখী। তাই এমন একটা বাঁশি হওয়া উচিত যে বাঁশির সুর শুনলে মানুষের মনের দুঃখ দূর হয়। জাদুকর হাতের ইশারায় একটি বাঁশি বের করে রাজার হাতে দিয়ে বলল, এটা বাজান মহারাজ।

বাঁশিটি রাজার হাতে দিয়েই জাদুকর অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজা বাঁশিতে সুর তুলল। সত্যি সত্যি তার মনের সব দুঃখ দূর হয়ে গেল। মন ভরে গেল শান্তিতে। রাজা এমনই শান্তি অনুভব করলেন যে, তিনি রাজকর্ম ভুলে গেলেন।

সেদিনের ঘটনার পর তিনি বাঁশি নিয়েই থাকেন দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। যখনই মনে কষ্ট অনুভব করেন তখনই বাঁশি বাজান। এভাবে দিন যায়, রাত যায়। রাজা নিজের রাজ্যের কথা ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন রাজকন্যার কথা এবং একদিন রাজা বাঁশিটি নিয়েই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বের হয়ে গেলেন পথে-প্রান্তরে। দেশ থেকে দেশান্তরে। রাজা নিজ রাজ্য ছেড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাঁশি বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর বাঁশির এই সুর শুনে পৃথিবীর অনেক মানুষই বাঁশি বানানো শিখে গেল। বাজাতে শিখল। আর এভাবেই পৃথিবীতে সৃষ্টি হলো বাঁশি। মানুষ এখন বাঁশি বাজায়। আর বাঁশির সুর শুনে মানুষ আনন্দ উপভোগ করে।

এখন যে-কোনো বাঁশি বাজালেই, একটি সুরের সৃষ্টি হয় 'রিমঝিম' 'রিমঝিম'। এই গহিনের সুর কেবল তারাই বুঝতে পারে যারা সুরের জাদু জানে। সাধারণ মানুষ কিন্তু তা শুনতে পারে না। ■

বিশ্ব শিশু দিবস

শাহানা আফরোজ

কিশোর কবি সুকান্ত বলেছিলেন

‘এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।’

শিশুরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। একদিন এই শিশুরা বড়ো হয়ে দেশ ও জাতির কাণ্ডারি হবে, তাই শিশুকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অভিভাবক ও রাষ্ট্রের। প্রত্যেক শিশুই জন্মগতভাবে কিছু অধিকার নিয়ে জন্মায়। শিশুর সেই অধিকার আমাদের পুরোপুরি আদায় করতে হবে। তবেই শিশু বড়ো হয়ে দেশ ও জাতির কর্ণধার হতে পারবে। শিশুদের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই প্রতি বছর সারা বিশ্বে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে ৭ই অক্টোবর এ বছর বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ বছরের বিশ্ব শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ‘আজকের শিশু আনবে আলো, বিশ্বটাকে রাখবে ভালো’। শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ, অধিকার ও উন্নয়ন ভাবনার জন্য এই বিশ্ব শিশু দিবস নির্ধারিত।

এ লক্ষ্যে শিশুদের চাহিদা, প্রাপ্তি আর প্রত্যাশা নিয়ে জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক শিশু সনদ ঘোষণা করেছে। ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের সদস্য দেশ ছিল ১৬০টি। তখন সবার মতামত নিয়ে এই সনদটি পাস করা হয়। ১৯৯০ সালে এটি আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশে পরিণত হয়। ইতিহাসে এটি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি। আনন্দের বিষয় হলো এই সনদের স্বাক্ষরকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। শিশু অধিকার সনদে ৫৪টি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে ১০ বছর ধরে আলোচনার পরেই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এই সনদ। এতে ১৮ বছর পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েকে শিশু–কিশোর ধরা হয়েছে।

১৯৯০ সালে শিশু অধিকার সনদ সারা বিশ্বে চালু হওয়ার পর প্রতিবছর ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। শিশুদের নিরাপদ জীবন দিতে, তাদের অধিকার সুরক্ষিত করতে জন্ম হয় আন্তর্জাতিক শিশু দিবসের। বর্তমানে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ পালনের অঙ্গীকার নিয়ে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রতিবছর ২০ নভেম্বর সার্বজনিন শিশু দিবস পালিত হচ্ছে। ১২ জুন বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। আমাদের দেশে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। শিশুরা মানসম্মত শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেড়ে উঠলে আমরা পাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ

কারিগর। সকল শিশুই ফুটফুটে চাঁদের মতো। শিশুরা তো আনন্দের প্রতীক। যারা পৃথিবীতে পরিপূর্ণ মানুষ হয়েছেন বা বড় হয়েছেন তারা সকলেই একদিন শিশু ছিলেন। তাই তো বলা হয়, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানও এক সময় শিশু ছিলেন। অথচ তার হাত ধরে বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। একদিন যিনি শিশু ছিলেন, তিনি হয়েছেন জাতির পিতা। আজকে যে শিশু আগামীতে সে হবে দেশের সুনাগরিক। শিশুদের ভেতরে সুপ্ত-প্রতিভা থাকে। আমাদেরকে কেবল এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে তাদের সেই প্রতিভা বিকশিত হতে পারে। এমন হতে পারে তাদের মাঝে থেকেই আমরা পেয়ে যাব ভবিষ্যতের ভাসানী কিংবা শের-ই-বাংলার মতো নেতৃত্ব। জগদীশ চন্দ্র বসুর মতো কোনো বিজ্ঞানী, রবীন্দ্র-নজরুলের মতো কবি-সাহিত্যিক, রফিক-শফিকের মতো ভাষাপ্রেমিক, মতিউর-হামিদুরের মতো দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধা।

তাই যারা দেশের ভবিষ্যৎ তাদেরকে তৈরি করতে হবে ভবিষ্যতের যোগ্য নির্মাতা হিসেবে। হাজার সংকটের মধ্যে থেকেও বাংলাদেশেও এখন শিশুদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার এবং শিশু অধিকার সনদ মেনে চলার অঙ্গীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশে তাই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী'র মতো প্রতিষ্ঠান। যা শিশুদের উন্নয়নের জন্য কার্যকরী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। শিশুদের অধিকার, সুরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে বেসরকারিভাবে সেইভ দ্য চিলড্রেন এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র, শিশু-শিক্ষা, চাইল্ড কেয়ার হোম ইত্যাদি। দেশব্যাপী শাপলা শালুক, ফুলকুড়ি, কঁচিকাচার মেলা, খেলাঘর-এর মতো শিশু সংগঠন গড়ে উঠেছে। নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন শিশু পত্রিকা। রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন অনুষ্ঠান। শুধু শিশুদের জন্য প্রচারিত হচ্ছে একটি আলাদা চ্যানেল। দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও থাকে শিশুদের জন্য বিশেষ পাতা। মানুষ এখন শিশুদের অধিকার নিয়ে সচেতন হচ্ছে এবং শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে। ■

এই শিশুরাই

চন্দনকৃষ্ণ পাল

এই শিশুরাই বড়ো হবে
ওরাই ভবিষ্যৎ
ওরা যেন ভালো থাকে
থাকে যেন সৎ।

আদর-স্নেহে ওদের যেন
বড়ো করে তুলি
স্বপ্নের এক বিশাল জগৎ
দিতেই হবে খুলি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে খেলাধুলায়
এগিয়ে দিতে হবে
দেশকে ভালোবাসবে তারা
সবার প্রিয় রবে।

বিশ্ব শিশু দিবসে এই
স্বপ্ন যে সবার
এই শিশুরাই জয়ী হবে
কখনো নয় হার।

ছোট্ট মেয়ে ইনি ও রানি পিঁপড়া

আহমাদ স্বাধীন

ছোট্ট মেয়ে ইনি, বিকেলের সোনালি রোদে খেলা করছিল মাঠে। ওর সাথিরা যখন এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে তখন ইনি কুট করে একটা পিঁপড়ার কামড় খেয়ে বসল পায়ে। ইনি পায়ের দিকে চেয়ে দেখল আরো কয়েকটি পিঁপড়া ওর পায়ে উঠে এসেছে, ইনি বুঝতে পারল এরাও ওকে কামড় বসাতেই এসেছে।

কী করা যায়, কী করা যায়.. হ্যাঁ এদেরকে মেরে ফেলা যায়। এটা ভেবে দুই হাতে দুটো পিঁপড়া তুলে নিল ইনি। আর তখনই কে যেন বলল- ওদেরকে মারবে না বলছি।

ছেড়ে দাও এক্ষুনি।

কে কথা বলছে, চারপাশটা চেয়ে দেখল ইনি, কোথাও তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

তবে কথা বলছে কে?

এ সময় আবার বলল- এমনিতেই তোমার পায়ের তলায় আমার কলোনির চারজন সদস্য মারা পরেছে।

আর একজনকেও মারবে না, বলে দিচ্ছি।

ইনি এতক্ষণ খেয়াল করেনি। ওর সামনেই একটা পিঁপড়ার ঢিবি। সেখান থেকেই একটা মোটাসোটা পিঁপড়া ওর সাথে কথা বলছে।

ইনি ভীষণ অবাক হয়ে বলল- আমি কখন তোমাদের সদস্যদের মারলাম, উলটো তোমরাই তো আমাকে কামড়ে দিলে।

হ্যাঁ কামড়ে দিয়েছে তোমার হাত থেকে বাঁচার জন্যই। আমরা কখনোই কাউকে এমনি এমনি আক্রমণ করি না, যতক্ষণ না কেউ আমাদের উপর হামলা করে। তুমি খেলতে খেলতে এদিকে এসে পায়ের তলায় ফেলে চারটা পিঁপড়া না মারলে ওরা কখনোই

তোমাকে কামড়াত না। আমি এই সব পিঁপড়ার রানি। এই যে দেখছ আমাদের পিঁপড়া কলোনি, এখানে আছে কয়েক লক্ষ পিঁপড়া। এদের সবার দায়িত্ব আমার। আমি এদেরকে নিয়ে আমাদের কলোনিতে শান্তিতে বাস করছি, আর তুমি এসে মারলে, এজন্যই তো ওরা তোমাকে আক্রমণ করে বসেছে।

পিঁপড়া রানির কথা শুনে ইনি বলল- কী বলছ তুমি, এটা তো একটা পিঁপড়ার ঢিবি, এটাকে তোমরা কলোনি বলো? এখানে কয়েক লক্ষ পিঁপড়া আছে? আর তুমি ওদের রানি? অবাক ব্যাপার তো!

পিঁপড়া রানি বলল- এতে আর কী অবাক হচ্ছো, আমাদের জীবন ব্যবস্থার ধরন জানলে তুমি আরো অবাক হবে। আমাদের কলোনি আরো অনেক বড়ো হয়।

এ পর্যন্ত তোমাদের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার করা সব থেকে বড়ো পিঁপড়ার বাসা পাওয়া গেছে ব্রাজিলে। প্রফেসর লুইস ফোর্গী এই পিঁপড়া কলোনি খুঁজে পাওয়ার পর খোদ জীববিজ্ঞানীরাই অবাক হয়ে যায়। সেই পিঁপড়ার কলোনি ছিল ৫০ হাজার স্কয়ার ফুট এলাকা জুড়ে অবস্থিত।

সেটি ভূপৃষ্ট থেকে ২৬ ফুট গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই কলোনিকে পিঁপড়াদের একটা মহানগরী বললে ভুল হবে না।

পিঁপড়াদের সেই মহানগরীতে বাতাস চলাচলের জন্য ছিল আলাদা সুড়ঙ্গ।

পর্যাপ্ত বাতাসের ব্যবস্থা ছিল সেই মহানগরীতে।

ওই মহানগরীতে ছিল একটি মহাসড়ক যা মহানগরীর কেন্দ্রকে আশেপাশের অংশের সাথে যোগ করে রেখেছিল। মহানগরীতে পিঁপড়ারা গড়ে তুলেছিল ফাঙ্গাসের বাগান।

সেখানে তারা ফাঙ্গাসের চাষ করত। এই ফাঙ্গাস লার্ভা পিঁপড়ার মূল খাবার।

সেখানকার রানি পিঁপড়ার বাসস্থান সব থেকে বড়ো করে গড়ে তোলা হয়েছিল।

আর আশেপাশে যত জায়গা আছে সবগুলো সৈনিক পিঁপড়াদের থাকার স্থান।

সেই মহানগরীটা যেই প্রজাতির পিঁপড়ারা গড়ে তুলেছিল সেই প্রজাতির পিঁপড়ার নাম হচ্ছে লিফ কাটার অ্যান্ট।

মানে হচ্ছে পাতাখেকো পিঁপড়া। এই লিফ কাটার প্রজাতির পিঁপড়ারাই সব থেকে জটিল সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। এই কারণেই এদের মহানগরী এতটা জটিলভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

রানি পিঁপড়ার অধীনে ৩০০ মিলিয়ন পিঁপড়া সেই মহানগরীতে বসবাস করত।

মহানগরীর একটা অংশ শুধু মাত্র আবর্জনা সংরক্ষণের জন্য ছিল।

সেই মহানগরী তৈরি করতে পিঁপড়াদের মোট ৪০ টনের মতো মাটি সড়াতে হয়েছিল।

আমাদের পিঁপড়া সমাজের সাথে তোমাদের মানুষের সামাজিক কাঠামোর অনেক মিল খুঁজে পাবে। যেমন পিঁপড়ারা ওদের সাথিদের মৃতদেহ কবর দেয়। আমাদের কাজগুলো আমরা ভাগ করে সবাই মিলে করি। প্রতিটা কলোনিতে আছে ম্যানেজার, সুপারভাইজার, সৈনিক, শ্রমিক! আমরা ভবিষ্যতের চিন্তা করে মানুষের মতো খাদ্য মজুদ করি, শুধু তাই নয়, আমাদের মজুদকৃত শস্যদানায় যদি কুঁড়ি গজায় সেই কুঁড়িগুলো কেটে ফেলি, যেন সেটা বড়ো হয়ে আমাদের শস্যকে নষ্ট করে না দেয়। কোনোভাবে শস্যদানাগুলো ভিজে গেলে, আমরা ওগুলো বাইরে এনে শুকাতেও দেই। যেন শস্যগুলো নষ্ট হয়ে না যায়!

আমরা পিঁপড়ারা হলাম ফর্মিসিডি গোত্রের অন্তর্গত সামাজিক কীট বা পোকা। এখন পর্যন্ত জানা প্রায় ২২,০০০ পিঁপড়া প্রজাতির মধ্যে ১২,৫০০টির শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে, তোমরা শুধু এই শ্রেণি পিঁপড়া নিয়েও জানো, বাকিগুলো এখনো অজানা।

এছাড়াও পিঁপড়া যখন পথ চলে,তখন চলার পথে চিহ্ন রেখে যায়; অনেকটা সাইনবোর্ডের মতো। ফলে দলের অন্যান্য পিঁপড়ারা সহজেই সেই পথ অনুসরণ করতে পারে। চলার পথে পদচিহ্ন হিসেবে পিঁপড়া রেখে যায় এক প্রকার গন্ধযুক্ত ফ্লুইড। যাত্রার শুরুতেই, পিঁপড়া পেট থেকে বের করে এই ফ্লুইড। তোমাদের মধ্যে অনেকে এটাকে এসিড মনে করে থাকে যা সত্য নয়। তবে পিঁপড়ার রং সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। লাল আর সবুজ বলের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাবে না পিঁপড়া।

তবে গন্ধ সম্পর্কে পিঁপড়ার দক্ষতা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। গন্ধযুক্ত একটা বস্তুর কোন জায়গায় গন্ধ বেশি আর কোন জায়গায় কম, এটা পিঁপড়া খুব সহজেই বুঝতে পারে। পিঁপড়ার আছে শারীরিক শক্তির খুব সুনাম। একটা পিঁপড়া তার শরীরের থেকে অনেক বেশি ওজন বহন করতে পারে অনায়াসেই।

রানি পিঁপড়ার মুখে সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল ইনি। একদম চুপ করে শুনছিল কথাগুলো।

এরপর বলল- তোমাদের সমাজব্যবস্থা এত সুন্দর গোছানো! আমি তো এটা জানতামই না। খুব খুশি হলাম তোমার কাছে শুনে। আমার ভুল হয়ে গেছে ভাই। জানো তো, আমি ইচ্ছে করে চারটি পিঁপড়াকে মারিনি। আর কখনো মারব না পিঁপড়া আমি কথা দিলাম।

সেই সাথে আমার সাথিদেরকেও বলে দেবো যেন অকারণে পিঁপড়া ঢিবিতে আক্রমণ না করে। পিঁপড়া রানি বলল - পিঁপড়া ঢিবি বলবে না, বলো পিঁপড়া কলোনি।

- ও হ্যাঁ, পিঁপড়া কলোনি।

এ সময় ওর খেলার সাথিরা ওর কাছে চলে এল। বলল- কী ব্যাপার ইনি, কার সাথে কথা বলছ?

- পিঁপড়া রানির সাথে। এই সাবধানে হাঁটো, এখানে পিঁপড়ার কলোনি আছে, ওদেরকে পায়ের তলায় ফেলো না যেন। চলো আমরা ওদিকটায় গিয়ে খেলি। যাতে পিঁপড়া কলোনির কোনো ক্ষতি না হয়।

ইনির খেলার সাথিরা শুধু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েই রইল। কিছু বুঝতে পারল না।

ওরা তো জানে না, যে ইনি ওদের থেকে কতটা বেশি অবাক হয়েছে।

পিঁপড়া রানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবাইকে নিয়ে চলে গেল ইনি। তারপর আবার মেতে উঠল খেলায়।

ওদিকে পিঁপড়া রানি ওর কলোনির সবাইকে নিয়ে নিরাপদে রইল। ■

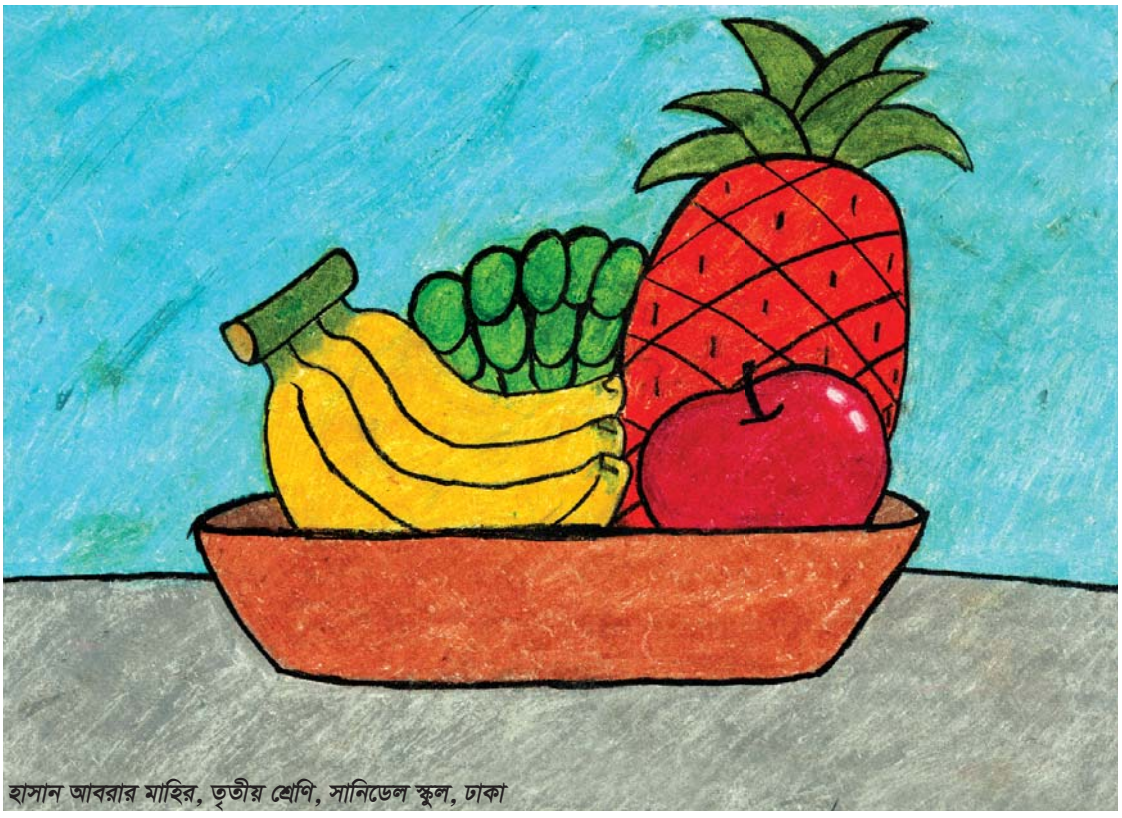

হাসান আবরার মাহির, তৃতীয় শ্রেণি, সানিডেল স্কুল, ঢাকা

কবিতা গুচ্ছ

স্বপ্নকুমার

রহীম শাহ

ক্ষুধার দেশের দুস্যগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে এসে
সবকিছু তছনছ করে দেয় সবুজ-শ্যামল দেশে।
একটি-দুটি, শত শত হাজার হাজার করে
দস্যুগুলোর থাবায় পড়ে লক্ষ মানুষ মরে,
সবুজ দেশের কোলাহলে কী যে আহাজারি,
অন্ধকারে ছেয়ে গেল আলোকমালার বাড়ি।
বনের পশু, গাছের পাখি রক্তরাঙা খুনে
ধুলোতে যায় গড়াগড়ি; এমন খবর শুনে–
সবুজ দেশের একটি ছেলে গা দিয়েছে ঝাড়া,
ক্ষুধার দেশের দস্যুগুলো খড়্গ করে খাড়া।
স্বপ্নকুমার সেই ছেলেটি বংশী নিয়ে হাতে
শহর-নগর-গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে দিনেরাতে।
বংশীবাদক সেই ছেলেটি পেছন ফিরে দেখে
সবুজ দেশের দস্যুগুলো বেরোয় একে একে।
বংশীবাদক বাঁশির সুরে কাঁপন তুলে যায়
খাদক দলও নেশায় মেতে পেছন পেছন ধায়।
শহর-নগর-গ্রাম-গঞ্জ অলিগলি ঘুরে–
বংশীবাদক ছুটে গেল অনেক অনেক দূরে।
পদ্মা নদী, মেঘনা নদী– হাজার নদীর পর
সবুজ দেশের শেষ প্রান্তে বঙ্গোপসাগর;
সাগরপাড়ে বংশীবাদক হঠাৎ গেল থেমে
নরখাদকের দলই কেবল সাগরে যায় নেমে।
ক্ষুধা মেটায় হাঙর তিমি অনেক বছর পর
আলোয় আলোয় ভরে গেল বিজন তেপান্তর।

ভুলো না আমায়

নাসিরুদ্দীন তুসী

ফেলে আসা ছেলেবেলা, রেখে আসা গ্রাম
বুকের ভেতর যেন ডাকে অবিরাম।
দিনেরাতে দুই হাতে ডাকে আয় আয়
চিঠি লিখে বলে যেন 'ভুলো না আমায়'।

ভুলিনি তোমাকে আমি, প্রিয় ছেলেবেলা
মনে পড়ে ফুটবল, ডাং-গুলি খেলা
'কুতকুত' খেলি আজও ধুলোমাখা পায়
ডাকে গ্রাম অবিরাম 'ভুলো না আমায়'।

সুপারির ঝরা পাতা আমাদের গাড়ি
মহাকাল মহাদেশ তাতে দেই পাড়ি
ছিল কাছে বন্ধুরা ছিল ভাইবোন
আলোকিত করে দিত বুকের উঠোন।

পুকুরে সাঁতার কেটে চোখ হতো লাল
দুই বেলা সেই খেলা সকাল-বিকাল
জোনাকিরা আলো নিয়ে নীল জোছনায়
আজও ডাকে আমাকে 'ভুলো না আমায়'।

দ্বন্দ্ব

মোহ্‌সেন আরা

এর সাথে ওর সাথে
করে তুমি দ্বন্দ্ব
জীবনের পাওয়া থেকে
পাবে কি আনন্দ?
ভালোবাসার গেয়ে গান
গাঁথা মালা ছন্দ
তা না হলে যত পাওয়া
হবে সব বন্ধ।

ঘুরে বেড়াই একা

আবদুল কুদ্দুস ফরিদী

জোছনা রাতে নিঝুম বনে ঘুরে বেড়াই একা,
পথ হারিয়ে এলোমেলো-পাই না পথের রেখা।
গা ছমছম পুকুর পাড়ে বিশাল আমের বন,
দিনের বেলা যেখানটাতে যাই না অকারণ।
রাতের বেলা দুঃসাহসী একলা হেঁটে চলি,
ভয়ের জুজু পুকুর জলে দিয়ে জলাঞ্জলি।
বনবাদাড়ে আলোয় কালোয় কী মোহ কী মায়া,
এখানটাতে ওখানটাতে আঁধার ছায়া ছায়া।
ভরদুপুরে বনের কোলে ঘুরে বেড়াই একা,
কোকিল ডাকে কুহুকুহু ময়ূর ডাকে কেকা।
বিজন বনে আপন মনে হাঁটতে লাগে ভালো,
বনের ছায়া শীতল কোমল, মাঠের ওপার আলো।
সন্ধ্যা-সকাল মাঠে ঘাঠে ঘুরে বেড়াই একা,
চোখে ভাসে অচিন কোনো দিগন্ত দূর রেখা।
উদাস উদাস বাউল মনের আমি যে এক কবি,
দু-চোখ ভরে চেয়ে দেখি রূপের প্রতিচ্ছবি।

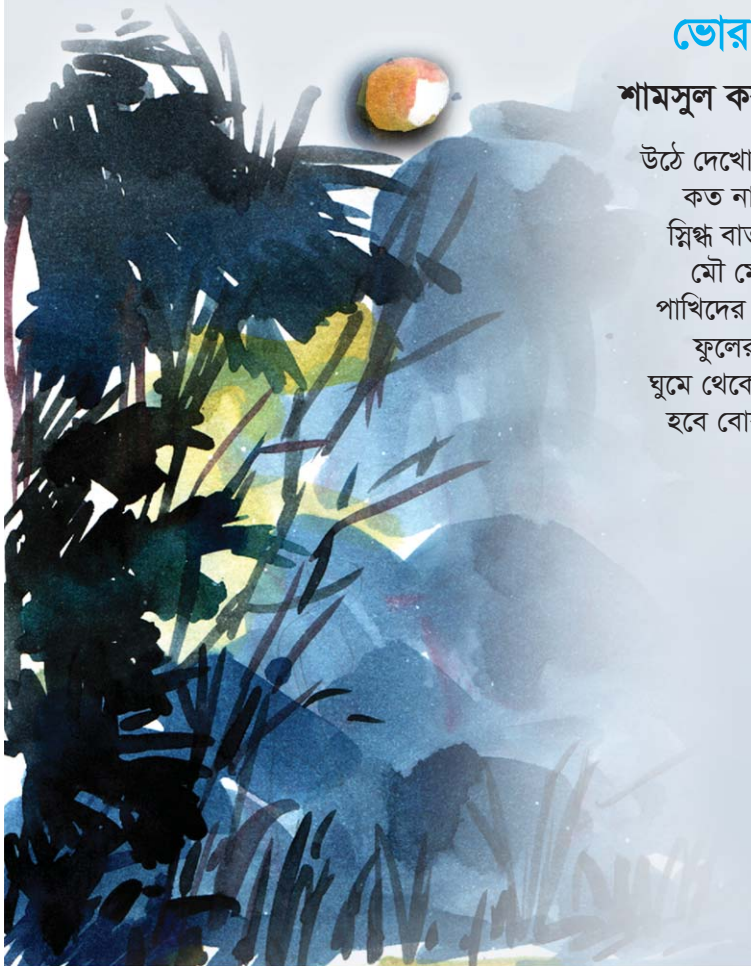

সিঙ্গাড়া

প্রজীৎ ঘোষ

বাজার থেকে বাবা সেদিন
এনেছিল ভাজি;
এত্ত মজার ভাজি খেতে
ছিলাম আমি রাজি।

তাই প্রতিদিন বলি 'বাবা!
কিনে এনো ওটা ;
দেখতে যেন ত্রিভুজ লাগে
পেটটি ভারি মোটা।'

মা রেগে কন না! না! ওসব
আর এনো না ঘরে ;
তেলে ভাজা কিছু খেলেই
বুকে জ্বালা করে।

মিষ্টি হেসে বলেন বাবা
ওতেই দিশেহারা?
দুষ্টু সোনা নাম জানো না
নামটি ওর সিঙ্গাড়া।

ভোর বেলা

শামসুল করীম খোকন

উঠে দেখো ভোর বেলা
কত না আনন্দ
স্নিগ্ধ বাতাস জুড়ে
মৌ মৌ গন্ধ!
পাখিদের লাফালাফি
ফুলের সুগন্ধ
ঘুমে থেকে কেন তুমি
হবে বোকা, অন্ধ?

এক দুই তিন

মো. সাফায়াত হোসেন

এক দুই তিন
আজকে খুশির দিন
চার পাঁচ ছয়
আজ নেই কোনো ভয়।
সাত আট নয়
আজকে করব জয়
দশ এগারো বারো
সব কিছু করো যা তোমরা পারো।
তেরো চৌদ্দ পনেরো
পরীক্ষা শেষে যা ইচ্ছা করো
আমরা করব জয়, যতই থাকুক ভয়।

৫ম শ্রেণি, মহানগর আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

গল্প

ইচ্ছেবুড়ি ও কথা বলা ময়না

পলাশ মাহবুব

ময়না পাখির নাম 'কথা'। কারণ সে কথা বলতে পারে।

ইচ্ছেবুড়িদের বাসায় নতুন কেউ বেড়াতে এসে যখন ইচ্ছেকে জিজ্ঞেস করে- বাবু, তোমার নাম কী?

তখন পাশ থেকে ইচ্ছেবুড়ির ময়না পাখিটা জবাব দেয়- আমার নাম কথা। আমি একটি কবিতা বলব।

ময়না পাখি কবিতা বলার ব্যাপারটা ইচ্ছের কাছ থেকে শিখেছে। স্কুলের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জন্য ইচ্ছেকে একটা কবিতা মুখস্থ করতে হয়েছিল। তখন সে এভাবে মুখস্থ করেছে- আমার নাম মিথিলা তাবাসসুম ইচ্ছে, আমি একটি কবিতা বলব। আমার কবিতার নাম...

সেখান থেকে ময়না পাখিটাও মুখস্থ করে নিয়েছে। কখনো কখনো ইচ্ছের হয়ে অনেক প্রশ্নের জবাব ময়না পাখিটাই দিয়ে দেয়। এই যেমন ইচ্ছের মা হয়ত বললেন, টিভির রিমোটটা কোথায় রেখেছ ইচ্ছে?

ময়না পাখি পাশ থেকে জবাব দেয়, টেবিলের ওপর আছে। টেবিলের ওপর আছে।

এমন কথা বলা ময়না পাখির একটা নাম থাকতেই পারে। আর নামটা যদি হয় 'কথা' তাহলে তো কথাই নেই।

ময়না পাখির 'কথা' নামটা ইচ্ছেই রেখেছে। ময়নার প্রথম জন্মদিনে।

পাখিটা বাসায় আসার কিছুদিন পর ইচ্ছের মাথায় এল ময়না পাখির জন্মদিন পালন করতে হবে। বছর বছর তার যেমন জন্মদিন পালন করা হয় ঠিক সে রকম করে।

এই নিয়ে বাবা-মা'র সাথে সারাক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল ইচ্ছে।

কবে জন্মদিন পালন করবে। বলো না মা, কবে করবে ময়না পাখির জন্মদিন?

মা বললেন, পাখির আবার জন্মদিন কীসের রে? ও কি মানুষ! যা তো বিরক্ত করিস না।

ইচ্ছে বলল, মানুষ না হলে কী হবে, মানুষের মতো কথা তো বলতে পারে। তাই ওরও জন্মদিন হতে পারে। হুম।

ইচ্ছের কথায় যুক্তি আছে। মা তাই কথা বাড়ালেন না। শুধু বললেন, তোর যা ইচ্ছে কর।

যা খুশি কর বললেই তো আর করা যায় না। ইচ্ছে ছোটো মানুষ। সে কি আর জন্মদিনের আয়োজন করতে পারে! জন্মদিন আয়োজনের কত ঝামেলা। কেক কেনা, মোমবাতি কেনা। সে তাই বাবার কাছে গেল। কারণ বাবাকে বললে কাজ হয়। বাবা তার সব কথা শোনেন।

সব শুনে বাবা বললেন, আইডিয়াটা তো খুবই চমৎকার। পাখির জন্মদিন পালন। কিন্তু ময়না পাখিটার জন্ম তারিখ কত? তুই জানিস?

ইচ্ছে মাথা নাড়ে। পাখির জন্ম তারিখ সে কীভাবে জানবে!

হুম। বাবার কপালে চিন্তার ভাঁজ।

কিন্তু একটা তারিখ তো লাগবে। তারিখ না থাকলে জন্মদিন কীভাবে হবে!

বাবার কথা শুনে ইচ্ছেবুড়ির আশাবাদী মুখটা মুহূর্তে মলিন হয়ে যায়। এটা তো আসলেই একটা সমস্যা। জন্ম তারিখ তো জানা চাই।

ইচ্ছেকে মন খারাপ করতে দেখে বাবাই উপায় বের করলেন। আচ্ছা ঠিক আছে, পাখির বাবা-মা তো আর ছানাদের জন্ম তারিখ লিখে রাখে না। আমরা এক কাজ করি বরং, ময়না পাখিটা যেদিন আমাদের বাসায় এসেছে সেই তারিখটাকেই ওর জন্মদিন ধরি। কী বলিস?

বাবার কথা শুনে লাফ দিয়ে উঠল ইচ্ছে। মাথার দুই বেণি দুলিয়ে বলল, হ্যাঁ। তাই করো বাবা।

আচ্ছা তাই করলাম। ইচ্ছের মতো মাথা দোলান বাবা। তারপর ক্যালেন্ডার ঘেঁটে-ঘুঁটে ময়না পাখির বাসায় আসার তারিখটা বের করেন।

আঠারোই মে। তাহলে আগামী বছরের এই তারিখে ময়না পাখির জন্মদিন পালন করব আমরা। ঠিক আছে?

আগামী বছরের কথা শুনে ইচ্ছেবুড়ির মন আবারও খারাপ হলো।

এক বছর পরে!

হুম। জন্মদিন তো এক বছর পরে পরেই আসে মা।

না না। এখনই জন্মদিন পালন করতে হবে। বাবা প্লিজ।

ইচ্ছের জেদ দেখে বাবা কিছু সময় ভাবেন। তারপর বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। করা হবে জন্মদিন। মানুষের জন্মদিন এক বছর পর পর আসে বলে পাখির জন্মদিনও যে এক বছর পরে আসবে এমন কোনো কথা নেই। পাখির জন্মদিন চার মাস পর পরও আসতে পারে। কি বলিস, পারে না?

ইচ্ছে মাথা দুলিয়ে বলল, হ্যাঁ, পারে তো।

শেষে তাই হলো। ইচ্ছের ইচ্ছায় তাদের বাসায় আসার চার মাসের মাথায় ময়না পাখির জন্মদিন পালন করা হলো। সেই জন্মদিনে ইচ্ছের দাদা ভাইও এসেছিলেন।

ময়না পাখিটা অবশ্য ইচ্ছেকে তার দাদা ভাই দিয়েছেন।

চার মাস আগে ইচ্ছেবুড়ির দাদা ভাই বেড়াতে এসেছিলেন ওদের বাসায়। ইচ্ছেবুড়ির দাদা ভাই গ্রামের বাড়িতে থাকেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছেদের বাসায় বেড়াতে আসেন, ইচ্ছেকে দেখতে। তখন ইচ্ছের জন্য কত কী যে নিয়ে আসেন তিনি। বাড়ির গাছের

আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল থেকে শুরু করে ঘরে পালা মুরগি, গরুর দুধ আরো কত কী। যখনই আসেন দাদা ভাইয়ের হাত ভরা থাকে নানান ব্যাগপত্রে। সেবার তিনি আরো অনেক কিছুর সঙ্গে একটা ময়না পাখিও এনেছিলেন ইচ্ছেবুড়ির জন্য।

গ্রামের ময়না পাখি। দেখতে ভারি সুন্দর। ময়না পাখিটা পটর পটর করে মানুষের মতো কথাও বলতে পারে। ময়না পাখিকে মানুষের মতো কথা বলতে দেখে ইচ্ছে তো ভীষণ অবাক!

পাখিরা কি মানুষের মতো কথা বলতে পারে!

দাদা ভাই বললেন, সব পাখি পারে না। তবে কিছু কিছু ময়না পাখি পারে। যেমন এই ময়না পাখি পারে।

ময়না পাখিটাকে ইচ্ছেবুড়ির ভীষণ ভালো লেগে গেল।

ইচ্ছের মা বললেন, এমনিতেই অ্যাকোয়ারিয়াম ভর্তি মাছ নিয়ে ইচ্ছের অস্থিরতার শেষ নেই। সারাক্ষণ শুধু মাছের চিন্তা। এবার যোগ হলো ময়না পাখি। পড়াশোনায় মন আর থাকল না।

ইচ্ছেবুড়ির মায়ের কথা শুনে তার দাদা ভাই হাসেন। তুমি একদম চিন্তা করো না বউমা। আমার দাদা ভাই আর যাই করুক পড়াশোনাটা সে ঠিকঠাকই করবে, তাই না দাদা ভাই?

ইচ্ছে তার দুই বেণি দুলিয়ে বলল, করি তো দাদা ভাই।

তারপর সে ময়না পাখি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল।

দুই

অল্প সময়ের মধ্যে ময়না পাখির সাথে ইচ্ছের বেশ ভাব হয়ে যায়। শুরু থেকেই পাখির খাঁচাটা ইচ্ছের ঘরে রাখা হয়েছে। প্রথম প্রথম অবশ্য পাখিটাকে খাঁচা বন্দি করে রাখা হয়েছিল। যদি উড়ে চলে যায় এই ভয়ে।

এখন পাখির খাঁচা খোলাই থাকে। ময়না পাখি সারা ঘরময় ইচ্ছের কাঁধে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। তার সাথে কথা বলে। টিভি দেখে। গান গায়। শুধু ইচ্ছে যখন স্কুলে থাকে তখন আর ঘুমের সময়টায় খাঁচায় ঢোকে ময়না।

সকালবেলা ইচ্ছে যখন স্কুলে যায় ময়না পাখিটা বলে, আমিও যাব। আমিও যাব।

ইচ্ছে বলে, তুমি এখনো ছোটো। বড়ো হলে যাবে।

ময়না পাখিটা তখন জবাব দেয়, বড়ো হলে যাব। বড়ো হলে যাব।

ইচ্ছে যা যা বলে ময়না পাখি তাই তাই অবিকল অনুকরণ করে। পাখিটার দারুণ স্মৃতিশক্তি। ইচ্ছে যেভাবে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে ময়না পাখিটাও তাই করে। ইচ্ছে যেভাবে তার বাবার কাছে আবদার করে ময়না পাখিটাও সেভাবে করতে পারে।

ইচ্ছের বাবা যখন অফিসে থাকে ইচ্ছে মাঝে মাঝে বাসার মোবাইল ফোন থেকে বাবাকে ফোন দেয়।

বাবা, তুমি কখন আসবে? তাড়াতাড়ি বাসায় আসো।

পাশ থেকে ময়না পাখি বলে, তাড়াতাড়ি আসো। তাড়াতাড়ি আসো।

ইচ্ছের বাবা-মা দুজনে যেহেতু ব্যস্ত থাকেন ইচ্ছের বেশিরভাগ সময় এই ময়না পাখিটার সাথেই কাটে। ভালোই কাটে।

ইচ্ছের মা-ও এখন অনেকটা নিশ্চিত। কারণ ময়না পাখিটা আসার পর একটা ভালো কাজ হয়েছে। আগে ইচ্ছে মোবাইল ফোন দিয়ে সারাক্ষণ ইউটিউবে ভিডিও দেখত। এখন আর সেই অভ্যাসটা নেই।

দিনে দিনে 'কথা' নামের ময়না পাখিটা ইচ্ছেদের পরিবারের সদস্য হয়ে যায়। দারুণ কাটছিল ইচ্ছের দিনগুলো।

তিন

একদিন দুপুরবেলা ঘটল এক ঘটনা।

বাসায় শুধু ইচ্ছে আর তার ময়না পাখি 'কথা'।

ইচ্ছের বাবা অফিসে। আর মা গেছেন তার এক বান্ধবীর বাসায় কিছু জামাকাপড় ডেলিভারি দিতে। মায়ের বান্ধবী

দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন। নিজে না গেলেই নয়।

ইচ্ছের মায়ের একটা অনলাইন শপ আছে। জামাকাপড় আর গহনার। আগে একবার জামাকাপড় আর গহনা চুরির জন্য ইচ্ছেদের বাসায় চোর ঢুকেছিল। ইচ্ছের উপস্থিত বুদ্ধিতে সেবার হাতেনাতে ধরা পরেছিল দুই চোর। এরপর থেকে তার বাবা-মা বেশ সতর্ক হয়ে গেছেন। কিন্তু চোরের তো আর অভ্যাস বদলায় না।

সুযোগ বুঝে দুই চোর আবারো ঢুকল ইচ্ছেদের বাসায়। ইচ্ছে তখন বিছানায় বসে ময়না পাখিকে তাদের বাসার ঠিকানা মুখস্থ করাচ্ছিল। ইচ্ছের ধারণা ময়না পাখি যদি কখনো হারিয়ে যায় ঠিকানা মুখস্থ থাকলে লোকজন তাকে পথ দেখিয়ে দেবে।

চাবি নকল করে ইচ্ছেদের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল দুই চোর। ছোটো চোর আর বড়ো চোর। তাদের উদ্দেশ্য ইচ্ছের মায়ের অনলাইন শপের দামি জামাকাপড় আর গহনা চুরি করা।

ঘরের মধ্যে ঢুকে ছোটো চোর বলল, বাড়িতে মনে হয় কেউ নাই ওস্তাদ। আজকে আর সেই দিনের মতো বিপদে পড়তে হবে না। পিচ্চি মেয়েটা সেই দিন যা করল। ওর জন্য এক মাস জেল খাটতে হইল।

বড়ো চোর ঠোঁটের কাছে আঙুল এনে বললেন, শিসসস। কথা কম বল। কারো আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে মনে হয়।

বড়ো চোরের কথায় ছোটো চোর তার কান খাড়া করে। সেও কারো গলার আওয়াজ শুনতে পায়। কে যেন কথা বলছে।

ওস্তাদ, সেই মেয়েটার গলাই তো মনে হইতেছে। আজকে প্রথমেই ওরে বানতে হইব। কোনো কথা নাই।

দুই চোর গুটিগুটি পায়ে ইচ্ছের রুমের সামনে আসে। তাদের দুজনের মুখ গামছা দিয়ে ঢাকা। ছোটো চোর দরজার আড়াল থেকে রুমের মধ্যে উঁকি দেয়। রুমের মধ্যে ইচ্ছেবুড়ি আর ময়না পাখি কথা বলছে।

দুই চোর রুমের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই ইচ্ছের মুখ আর হাত বেঁধে ফেলে। পা-ও বাঁধতে চেয়েছিল ছোটো চোর। বড়ো চোর বলল, থাক, আর কিছু বান্ধনের দরকার নাই। ছোটো মানুষ। আওয়াজ না করতে পারলেই হইল।

ইচ্ছেকে বাঁধতে দেখে ময়না পাখি বলল, তোমরা কারা? তোমরা কারা?

ময়না পাখিকে কথা বলতে দেখে ছোটো চোরের হাসি পায়। সে হাসতে হাসতে বলে, আমরা হইতেছি চোর। এই পাখি চুপ থাক।

ময়না পাখিও বলল, চুপ থাক। চুপ থাক।

ছোটো চোর ময়না পাখিকে ধরার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু ধরতে গেলেই ময়না পাখি উড়ে যায়। পাখি ধরা কী এত সোজা।

ময়না পাখি উড়ে উড়ে বলল, কী হয়েছে? কী হয়েছে?

ছোটো চোর হাসতে হাসতে বলল, কী হয়েছে? কী হয়েছে? চোর এসেছে। চোর এসেছে।

বড়ো চোর বলল, পাখির পিছনে সময় নষ্ট করে লাভ নাই। চল আসল কাজে যাই।

তারা দুজন ইচ্ছেবুড়ির রুমের দরজা আটকে দিয়ে মায়ের স্টোর রুমের দিকে চলে গেল। তারপর চুরি করা আরম্ভ করল।

ওদিকে মুখ-হাত বাঁধার কারণে ইচ্ছেবুড়ির বেশ কষ্ট হচ্ছে। তার চোখ ফেটে কান্না চলে এল। মুখ বাঁধা থাকার কারণে শব্দ করে কাঁদতেও পারছে না সে। ময়না পাখি তার কাঁধে এসে বসেছে। তারও মন খারাপ।

ময়না পাখি বলল, কী হয়েছে? কী হয়েছে?

ইচ্ছেবুড়ি কোনো জবাব দিতে পারছে না। কান্না পেলেও সাহস হারায়নি ইচ্ছেবুড়ি। সে ভাবতে লাগল কী করা যায়। কী করা যায়।

মোবাইল ফোনটা তার পাশেই বিছানায় রাখাছিল। কিন্তু হাত বাঁধা থাকার কারণে ফোনটা হাতে নিতে পারছে না সে। মুখও বাঁধা। কথা বলারও উপায় নেই। ইচ্ছেবুড়ি করুণ চোখে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এভাবে কিছু সময় পার হবার পর হঠাৎ ইচ্ছেবুড়ির মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ইচ্ছেবুড়ি তার দুই পা বিছানার ওপরে তুলল। তারপর পায়ের আঙুল দিয়ে মোবাইল ফোন ডায়াল করার চেষ্টা শুরু করল।

একবার। দুইবার। তিনবার।

চতুর্থবারে গিয়ে সফল হলো সে। মোবাইলের ফোন বুকে প্রথমেই দুটো নাম্বার সেভ করা- বাবা, মা।

ইচ্ছের বাবাই সেভ করে রেখেছেন। যাতে ইচ্ছে যখন-তখন কল করতে পারে।

ইচ্ছে তার পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাবার নাম্বারে ডায়াল করল।

এক রিং... দুই রিং... তিন রিং...

তিনবার রিং হওয়ার পর ইচ্ছেবুড়ির বাবা ফোন ওঠালেন।

হ্যালো, মামনি... কী করছ তুমি? ফোন দিয়েছ কেন?

ইচ্ছের দিক থেকে কোনো জবাব নেই।

ইচ্ছের বাবা আবার বললেন, হ্যালো, আম্মু... কথা বলছ না কেন? মা বকা দিয়েছে? রাগ করেছ? আচ্ছা আজ বাসায় ফিরে মাকে বকে দেব।

এদিক থেকে তাও কোনো কথা নেই। ইচ্ছের বাবার এবার টেনশন হলো।

কী হয়েছে? বলো। হ্যালো... হ্যালো...

ইচ্ছে কোনো জবাব দিতে পারছে না। ওদিকে ময়না পাখি মোবাইল ফোনের দিকে তাকিয়ে আছে। ফোনের স্ক্রিনে আলো জ্বলছে।

ইচ্ছে এবার ময়না পাখিকে চোখের ইশারা করল।

ইচ্ছের বাবা আবার জানতে চাইল, কী হয়েছে? কী হয়েছে?

এবার ময়না পাখিটা জবাব দিল, চোর এসেছে, চোর এসেছে।

ময়না পাখিটা একনাগাড়ে এই কথাটা বলে যেতে লাগল, চোর এসেছে, চোর এসেছে। চোর এসেছে, চোর এসেছে।

ইচ্ছের বাবা শুধু বললেন, হোয়াট!

এরপর যা ঘটার দ্রুতই ঘটে গেল সব। ইচ্ছের বাবা যা বোঝার বুঝে গেলেন। তিনি ৯৯৯-এ ফোন করে দ্রুত বাসায় এলেন। পুলিশও চলে এল সময়ের আগেই।

পুলিশ এসে চোর দুটোকে পাকড়াও করল। চেনা চোর দেখে পুলিশ অফিসার বললেন, কী রে চোর, তোরা আবারো এসেছিস? ভালো হোসনি তাহলে!

বড়ো চোর বলল- স্যার, আমরা জানতাম চোরের দশদিন আর গৃহস্থের একদিন। কিন্তু এই বাসার ছোটো মেয়েটার কারণে প্রতিবারই ধরা খাইতেছি।

পুলিশ অফিসার চোরের পিঠে লাঠির বাড়ি দিয়ে বললেন, আজ তোদের আমি দশের নামতা শেখাব। চল থানায় চল। ■

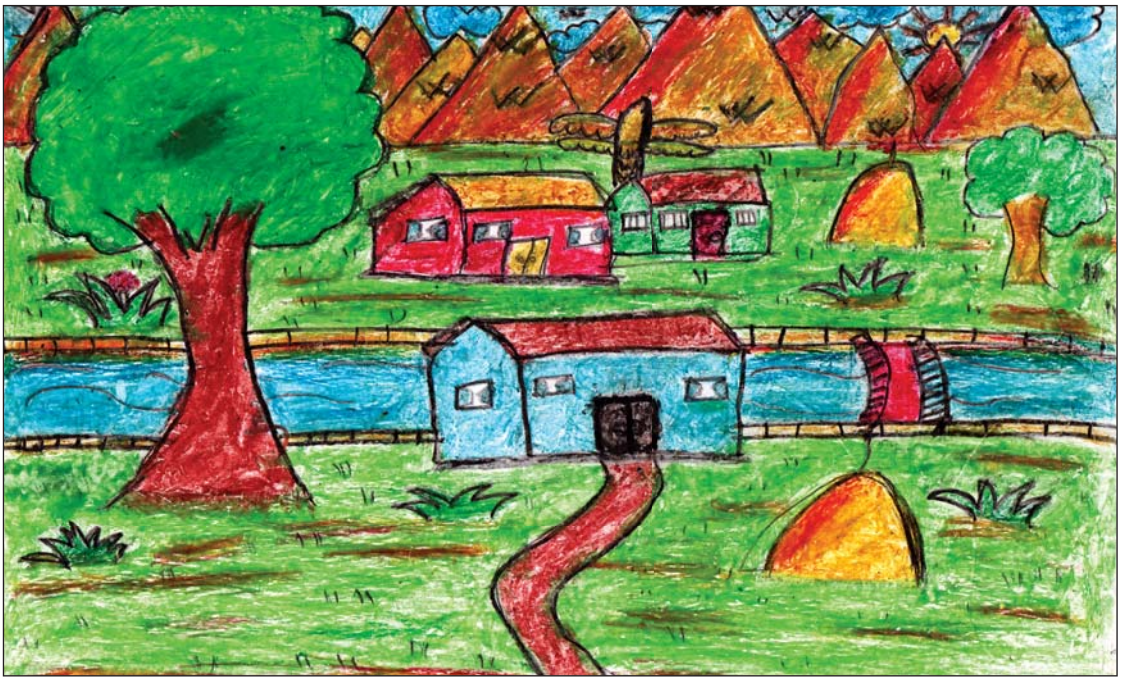

মুসতাহসান মুহাইমিন, তৃতীয় শ্রেণি, মাইলস্টোন স্কুল

অনুবাদ রূপকথা

বাতাবি গাছ ও শিম্পাঞ্জি

মোস্তাফিজুল হক

ছুটির সন্ধ্যা। অপু তার দাদুর পাশেই বসেছিল। হঠাৎ সে জানতে চাইল, 'দাদু, শিম্পাঞ্জির হাত ও পায়ের পাতা আমাদের মতোই কেন?'

দাদু: 'বহু পুরানো একটা গল্প আছে; ওটাই তাহলে শোনাই তোমাকে।'

'ঠিক আছে দাদু।'

এবার দাদু তার গল্পের ঝুড়ি খুলে বসলেন–

'গাঁয়ের কুঁড়েঘরে একাকী বাস করছিল এক চাষি পুত্র। আলসেমি করে করে জীবন থেকে সে এতই পিছিয়ে গেছে যে, কেউ তার খোঁজ নিতে চায় না। সে যে একটা কিছু করবে তারও উপায় নেই। সঞ্চয় বলতে এক কানাকড়িও নেই! অন্তত একটা দুধের গাই থাকলেও না হয় দুধ বেচে দুটো পয়সা পাওয়া যেত। হুহু করে শীত আসছে। জীর্ণ কুটির। ঘরে যেখানে রান্নার লাকড়িই মজুদ নেই সেখানে শীতের রাতে আগুন জ্বেলে উষ্ণতা নেবে, সে তো আশাতীত! এবার আলসে যুবক ভাবল, এভাবে বসে থাকলে চলবে না। ভাগ্যে তো একটা স্ত্রীও জুটল না! বেঁচে থাকতে হলে এবার পরিশ্রম করতে হবে। তাই সে একটা কুঠার হাতে নিয়ে বনের দিকে রওনা দিলো। বনের ভেতরে পৌঁছে এক বাতাবি লেবু গাছের তলায় বসল। অলস যুবকের মনে হলো এটা খুব একটা শক্ত বা বড়ো গাছ না; সুতরাং এটাকেই কাটা সহজ হবে। বিশ্রাম শেষ করে সে কুঠার দিয়ে যখন গাছে আঘাত করবে, তখন গাছটা তাকে অবাক করে দিয়ে বলতে লাগল–

'বাড়ি ফিরে যাও, বাপু। আমাকে কেটো না। তুমি সুন্দর ঘর, খাদ্যের মজুদ আর স্ত্রী পাবে।'

'কিন্তু আমার তো একটা গাই থাকা দূরের কথা, কানা পয়সাও নেই! তাহলে আমি এসব কী করে পাব?'

‘যাও বাছা, তুমি বাড়ি ফিরে গিয়েই এসব দেখতে পাবে।’

চাষি পুত্র দেরি না করে বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি এসেই তার মন আনন্দে ভরে গেল। কী সুন্দর সাজানো গোছানো ছিমছাম ঘর! প্রশস্ত উঠোনের কোণায় বাঁধা তেজি ঘোড়া। কিন্তু ঘরে ঢুকে তার বউয়ের চেহারা দেখে সে খুবই হতাশ হলো! তার বউ খুব একটা সুশ্রী নয়। সবার বউ দেখতে কত রূপসি, তবে তার বউ রূপসি হবে না কেন? সে আবার কুঠার হাতে বনে ঢুকে বাতাবি গাছের সামনে এসে দাঁড়ালে গাছটা বলল-‘কী হলো? কী চাই তোমার?’

‘হে দয়ালু মা, আমার বউ যে সুশ্রী নয়! আমার সুন্দরী বউ চাই?’

‘বাড়ি ফিরে যাও। তুমি এটাও পাবে।’

অলস যুবক বাড়ি ফিরে দেখে দুধে-আলতা গায়ের রং-এর অপূর্ব এক অষ্টাদশী নারী পরিপাটি করে ঘর গুছিয়ে খাবার সাজিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। এবার তার অনেক সুখ। স্ত্রীর সাথে খোশগল্প করে সময় কাটে। এদিকে অবস্থার পরিবর্তন হলেও লোকসমাজে তার তেমন কোনো মর্যাদা নেই। তাই সে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে সম্মান পেতে কুঠার হাতে আবার বনে চলে গেল।

বাতাবি গাছের শাখায় কুড়াল রাখতেই গাছ বলে উঠল-‘আবার কী চাই?’

‘আমার যে সম্মান নেই মা! আমি সম্মান পেতে চাই।’

‘ফিরে যাও। তোমার সব হবে।’

গাঁয়ের লোকজন অলস যুবককে এখন অনেক সম্মান করে। সংসারে সুখের সীমা নেই। তবু যেন মনে মনে অপ্রাপ্তি বা অপূর্ণতা বোধ করে। অবশেষে সে তার স্ত্রীর পাশে বসে বলল– ‘বউ আমাকে তো রাজবাড়ির লোকজন দেখলেই টুপি খুলে ফেলতে হয়! মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম দিতে হয়! এটা আমার ভালো লাগে না!’ এবারও সে স্ত্রীর পরামর্শে কুঠার নিয়ে বনে ঢুকল।

‘কী চাও মোহাবিষ্ট যুবক?’

‘ধন্যবাদ, আমার মা। আমার কাছে একটা বিষয় খুবই অসম্মানের হয়ে উঠেছে।’

‘বলো, কী বিষয়?’

‘মাগো, রাজবাড়ির লোকজন দেখলেই আমাকে টুপি খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম দিতে হয়; এটা আমার ভালো লাগে না।’

‘ঠিক আছে, বাড়ি ফিরে যাও। তুমি সব পাবে।’

এবার বাড়ি ফিরেই যুবক দেখতে পেল রাজবাড়ি থেকে রাজপেয়াদা চিঠি নিয়ে হাজির। তাকে রাজ্যের সম্মানিত নাগরিক হিসেবে রাজবাড়িতে আপ্যায়ন করানো হবে।

যুবকের আর খুশির সীমা নেই। মনের আনন্দে এক মাস কেটে গেছে। আবারও তার মনে নতুন করে হতাশা জেঁকে বসতে শুরু করেছে।

‘আচ্ছা বউ, এই যে আমি রাজবাড়িতে আপ্যায়িত হলাম, কিন্তু আমার তো কোনো পদ নেই! অন্যান্য অতিথিদের কত কত পদ!’

যুবকের কথা শুনে তার স্ত্রী বলল– ‘এই নাও কুড়াল। গাছ মাকে ভয় দেখিয়ে পদ নিয়ে এসো।’

স্ত্রীর পরামর্শে যুবক বনে ঢুকেই গাছ কাটার প্রস্তুতি নিতে থাকল।

‘আবার কী হলো? কী চাই তোমার?’

‘সবকিছুই তো ভালো, কিন্তু আমাকে একটা পদ দিতে তোমার আপত্তি কেন, মা?’

‘ঠিক আছে, ঘরে ফিরে যাও। এবার তোমার একটা পদও হবে।’

যুবক বাড়ি ফিরেই হাতে রাজার পত্রাদেশ পেলেন। তাতে লেখা রয়েছে সেনাপতির অধীনে তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদ দেওয়া হয়েছে। তার জন্য নতুন পোশাক আর অনেক উপঢৌকন পাঠানো হয়েছে। এবার শুধু গাঁয়ে নয় সারা দেশেই তাদের অনেক সম্মান। এত সব পেয়েও তবু যেন স্বামী-স্ত্রীর মনে শান্তি নেই। স্ত্রী বলল– ‘গাছ বুড়িটা তোমাকে সেনাপতির পদ দিলো না কেন?’ এবার যুবক খ্যাপে গিয়ে কুঠার নিয়ে বনে প্রবেশ করে গাছ কাটতে উদ্ধত হলো।

‘কী হলো মোহাবিষ্ট যুবক? আবার কী চাইছিস?’

‘আমার প্রতি তোমার কোনো দরদ নেই, মা। তুমি কী না আমাকে সেনাপতির পদ না দিয়ে বরং তার অধীনস্থ করেছ! এটা কেমন কথা? আমাকে সেনাপতির পদ দিতে হবে।’

‘এটা খুবই কঠিন কাজ।’

‘না, আমাকে এ পদ দিতেই হবে।’

‘যা, ঘরে ফিরে যা। তোর আশার সর্বোচ্চটাই পূরণ করতে চেষ্টা করব।’

এবার বাড়ি ফিরেই যুবকের চক্ষু ছানাবড়া! তাকে রাজ্যের সেনাপতি হিসেবে মনোনীত করে রাজা পাইক-পেয়াদা পাঠিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সাথে মখমলের পোশাক, রাজমালা, ঢাল-তলোয়ার, হীরকখঁচিত মুকুট, অত্যন্ত তেজি বেশ কয়েকটা ঘোড়া। ঝলমলে পত্রের ভাঁজ খুলতেই দেখতে পেলেন, রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকারও তার নামে লেখা রয়েছে। তাদের সংসারে আনন্দ আর ধরে না। তার স্ত্রী ঘরে শুয়ে-বসে থাকে, দাসীরা সেবাযত্ন করে। এতসব আরাম-আয়েশ পেয়ে এবার তার স্ত্রী ভাবতে থাকে- ‘আমার স্বামী যদি আজ রাজা হয়, তাহলে আজকেই আমি রানি হয়ে যাব!’

একদিন ভোরে সে তার স্বামীকে বলল- গাছ বুড়ি তোমাকে কেমন খাতির করে গো, তোমাকে রাজার পদ দিলো না? উত্তরাধিকার পাওয়ার আগে কে মারা যাবে তার ঠিক আছে? তুমি রাজার পদ নিয়ে এসো।

কিন্তু আমার মনে হয় এটা পেতে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এখনই এটা দেবে না।

এই নাও কুড়াল। না দিতে চাইলে ডাল কাটা শুরু করবে। আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

বনে প্রবেশ করেই যুবক এবার ভীষণ আক্রোশে গাছ কাটতে উদ্ধত হলো। এবার গাছ বুড়িও একটু রাগত-স্বরেই বলল- আবার কী চাই তোর?

শোন গাছ বুড়ি, তুই এত কৃপণ কেন? আমার এক্ষুণি রাজার পদ চাই।

ওরে মূর্খ মানব! এটা কখনোই সম্ভব নয়। সৃষ্টিকর্তা যাকে পছন্দ করেন, তিনিই রাজা হন। তোর অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ভালো চাইলে এক্ষুনি ঘরে ফিরে যা। আজকের পর থেকে আর কখনোই এখানে আসবি না।

না, আমি পদ না নিয়ে ঘরে ফিরে যাব না। এই যে তোর ডাল কাটতে শুরু করলাম।

এবার বাতাবি গাছ বলল–ঠিক আছে আজ থেকে তুই আর তোর স্ত্রী শিম্পাঞ্জি হয়ে পশুদের দলেই থেকে যাবি।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজন শিম্পাঞ্জি হয়ে যায়। তারা হারিয়ে ফেলে মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা আর কথা বলার শক্তি। ফলে তারা আর কোনো প্রায়শ্চিত্তই করতে পারেনি। সেই থেকে লোভী মানুষের অভিশপ্ত জীবন নিয়ে ওদের প্রজন্ম বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়।

[রাশিয়ার রূপকথা এ এইচ র্যাটিশ ল’র ‘দ্যা লাইম ট্রি’ গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত] ■

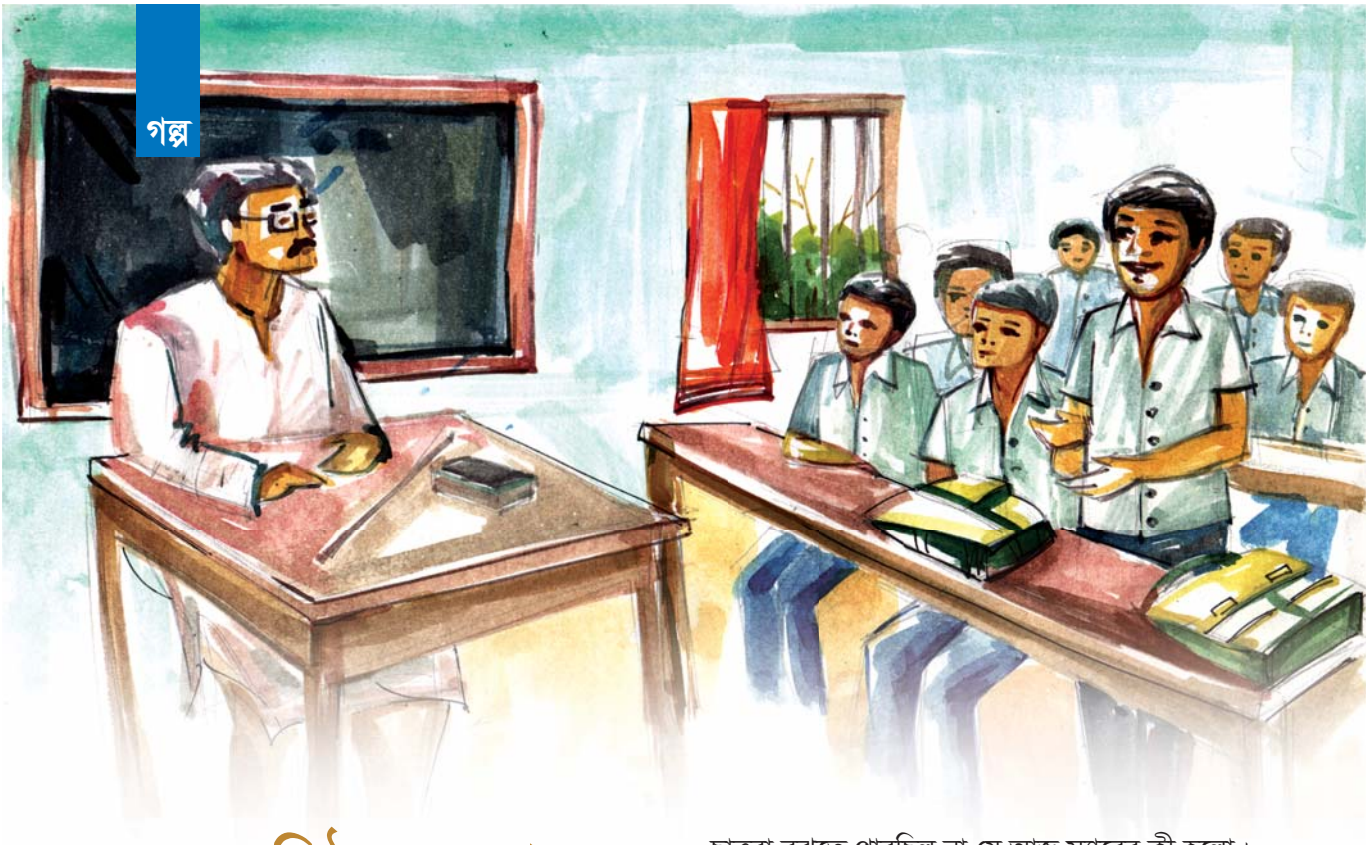

মিঠুনের স্বপ্ন

টি. এম তাহ্‌সিনা এনাম তৃষা

ক্লাস সেভেনের সেকশন এ, মৃত্যুঞ্জয় সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়। সারা ক্লাসরুমে পিনপতন নীরবতা। ক্লাসে এসেছেন বাংলার সিনিয়র শিক্ষক আমানুল্লাহ স্যার। পুরো স্কুল জুড়ে এক আতঙ্কের নাম আমানুল্লাহ স্যার। সবচেয়ে রাগী এবং গম্ভীর শিক্ষক তিনি। ছাত্রদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে তিনি খুবই কঠোর। সামান্য ভুলের জন্য তিনি রীতিমতো একশ বার কান ধরে উঠা-বসা করান। শোরগোল তিনি মোটেও পছন্দ করেন না। সব ছাত্ররা তাকে রীতিমতো যমদূতের মতো ভয় পায়।

অন্যান্য দিন ক্লাসে এসে রোল-কল করে বাংলা বইটা খুলে পড়ানো শুরু করেন। তারপর আগের দিনের পড়া ধরেন, তারপর যারা পড়া শিখে আসেনি তাদেরকে শাস্তি দেন। তবে আজ স্যার ক্লাসে এসে রোল কল করে বাংলা বইটা খুললেন না। ক্লাস- রুমের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর এসে বসলেন ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে রাখা চেয়ারটায়।

ছাত্ররা বুঝতে পারছিল না যে আজ স্যারের কী হলো। যাই হোক পড়া না ধরাতে কিন্তু মোটামুটি সব ছাত্রই ভীষণ খুশি। এই সুযোগে তারা বই খুলে আগের দিনের পড়াটা আর একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। আর কেউ কেউ আবার স্যার যেন পড়া না ধরে সেজন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে।

একটা গলা খ্যাঁকানি দিয়ে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন আমানুল্লাহ স্যার। ছাত্ররা সবাই নড়েচড়ে বসল। আমানুল্লাহ স্যার বললেন, 'আজ তোদেরকে পড়াব না। আজ বরং তোদের জীবনের লক্ষ্য শুনব। একে একে এখানে দাঁড়িয়ে বলে যাবি বড়ো হয়ে কে কি হতে চাস। খবরদার কেউ মিথ্যে বলবি না। মিথ্যে বললে আমি তার চোখ দেখেই বুঝে যাব। তারপর দুপুরের রোদের মধ্যে মাঠে দাঁড়িয়ে পাঁচশ বার কান ধরে উঠা-বসা করাব।'

স্যারের কথায় প্রাণ ফিরে পেল যেন সব ছাত্ররা। স্যার আজ পড়া ধরবেন না। কেউ শাস্তিও পাবে না। আর কি চাই! খুশিতে সব ছাত্র যেন আত্মহারা।

প্রথমে স্যার ডাকলেন ফার্স্ট বেঞ্চে বসা টিপুকে। হ্যাংলা পাতলা ছেলে টিপু। বছরের নয় মাস পেটের রোগে ভুগে। টিপকে দাঁড় করানো হলো তার জীবনের লক্ষ্য বলার জন্য। বুক ফুলিয়ে টিপু বলল, তার খুব

ইচ্ছা সে বড়ো হয়ে একজন মার্শাল আর্ট ট্রেইনার হবে। টিপুর কথায় ক্লাসের ছেলেরা মুখ টিপে হাসতে লাগল। গম্ভীর আমানুল্লাহ স্যার অব্দি তার হাসি চেপে রাখতে পারলেন না।

এরপর এল ক্লাসের সবচেয়ে মোটা ছেলে বিল্টু। লাজুক ভঙ্গিতে হেসে বিল্টু বলল, 'স্যার আমার বড়ো ইচ্ছা আমি শাকিব খানের মতো বড়ো নায়ক হব। আর অনেক নায়িকাদের সাথে সিনেমা করব।' বিল্টুর কথা শুনে সারা ক্লাসে ছাত্ররা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। আমানুল্লাহ স্যার ধমকের সুরে বললেন, 'তোর যে বিশাল স্বাস্থ্য, তার ওপর আবার নায়ক হবি। কোনো নায়িকা তোর সাথে সিনেমা করতে রাজি হবে না।'

বিল্টুর পরে রাজনের পালা। সে পড়ালেখায় মোটামুটি বেশ ভালো। রাজনের ইচ্ছা সে বড়ো হয়ে ডাক্তার হবে। গ্রামে একটা হাসপাতাল দেবে।

এরপর এল শাকিলের পালা। পাস না করতে পারায় গত তিন বছর ধরে সে ক্লাস সেভেনে আছে। এবারও পাস করার মতো সম্ভাবনা নেই। তবে তার জীবনের লক্ষ্য খুবই উন্নত। সে বিলেত থেকে উকিল হয়ে এসে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে চায়।

শুধু শাকিল নয়, পেছনের সারির দিলু, নিলু, অন্তু- তারাও একেকজন দেশের মন্ত্রী হতে চায়। আমানুল্লাহ স্যার তার ছাত্রদের কথা শোনেন আর মনে মনে হাসেন। বলেন, 'বেশি নাম্বার নিয়ে পাস করতে পারিস না, তোরা আবার সব সচিব মন্ত্রী হতে চাস! হাহা হাহা'

এবার স্যার দাঁড় করালেন মিঠুনকে। মিঠুন ক্লাসের ফার্স্ট বয়। অঙ্কতে সে সব সময় একশ তে একশ পায়। ইংরেজি আর বিজ্ঞানেও তার নাম্বারের ধারে কাছে কেউ যেতে পারে না। ড্রিল ক্লাসেও তার পারফরম্যান্স অসাধারণ। সবার ধারণা এটাই যে মিঠুন বড়ো হয়ে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার এমন কিছুই হতে চায়। বিল্টুর অবশ্য ধারণা অন্য। সে ভাবে মিঠুনও বুঝি তার মতো সিনেমার নায়ক হতে চায়।

সবার কল্পনার অবসান করে মিঠুন এবার বলল, 'স্যার আমি বড়ো হয়ে একজন কৃষক হতে চাই।

মিঠুনের কথায় যেন সবার মাথায় বাজ পড়ল। অবাক কাণ্ড। ক্লাসের ফার্স্টবয় আবার কখনো কৃষক হতে চায়! কৃষক তো হবে গরিব চাষা ভুষার ছেলেরা যারা কখনো লেখাপড়া করে না, স্কুলে যায় না সেই সব ছেলেরা। সেখানে মিঠুনের মতো অঙ্ক, ইংরেজিতে একশ তে একশ পাওয়া ছেলে কখনো কৃষক হতে চায়!

আমানুল্লাহ স্যার মিঠুনের উত্তরে রীতিমতো ভড়কে গেলেন। কপালে একটা ভাঁজ ফেলে, মুখে খানিকটা বিরক্তি এনে মিঠুনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্লাসের যদু, মদু, কদু যারা ঠিকমতো পাসই করতে পারে না তারা সব ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল হতে চায় আর তুই ক্লাসের ফার্স্ট বয়; তোকে নিয়ে তো বাবা-মার আর স্কুলের টিচারদের কত আশা। তুই কিনা সামান্য কৃষক হতে চাস?'

মিঠুনকে নিয়ে হাসাহাসি পড়ে যায় সারা ক্লাসে। দু-একটা ছেলে ব্যঙ্গ করে মিঠুনকে। চেয়ারম্যানের ছেলে নয়ন বিদ্রুপের হাসি হেসে বলে, 'কৃষকের ছেলে কৃষক হবে না তো আর কী হবে।' আমানুল্লাহ স্যার ধমক দিয়ে চুপ করায় সবাইকে। মিঠুনকে বলে, 'দেখতে পাচ্ছিস না সবাই হাসছে। তবুও তুই কেন কৃষক হতে চাস বল।'

আমানুল্লাহ স্যারের দিকে তাকায় মিঠুন। তারপর বলে, 'আমাদের ক্লাসে স্যার আটষট্টি জন ছাত্র আছে। তারা সবাই বড়ো হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিস্টার হতে চায়। তাহলে কৃষক হবে কে স্যার? মাঠে মাঠে ধান ফলাবে কে? আর ধান না হলে দেশের মানুষ খাবে কী স্যার? মাঠে যখন নতুন ফসল ফলে তখন যে আনন্দটা হয় তার তুলনা আর কোনো কিছুর সাথে হয় না। আর তাই স্যার আমি কৃষক হতে চাই। কৃষি কাজে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে চাই। দেশের সব মানুষের মুখে ভাত তুলে দিতে চাই স্যার। আর কোনো কাজই তো ছোটো নয়, তাই না স্যার?'

মিঠুনের উত্তরে আমানুল্লাহ স্যারের সারা শরীরে যেন শিহরণ খেলে গেল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কাছে গিয়ে মিঠুনকে জড়িয়ে ধরলেন। মাথায় হাত রেখে বললেন, 'মিঠুন রে, আজ তোর জন্যে গর্বে আমার বুকটা ভরে গেল। তুই এমন সব কথা বললি, যা আমি নিজে কখনো কল্পনাও করিনি। দোয়া করি বাবা তুই অনেক বড়ো হ। তোর মতো মিঠুনদের এই বাংলাদেশে খুব দরকার রে বাবা, খুব দরকার।' ■

কবিতা

ভূতের বাড়ি

শরীফ আব্দুল হাই

ভূতের বাড়ি পাগার পাড়ে
শেওড়া গাছে
দিন দুপুরে সাতটা ভূতের
ছানা নাচে।
ছানাগুলো কানা এবং
খোঁড়াও বটে,
বিছনা এবং বালিশ ছাড়া
ঘুমায় চটে।
একটা লাফায় দুইটা নাচে,
তিনটা কাঁদে,
বাকি একটা গামছা দিয়ে
কোমর বাঁধে।
ক্ষুধা পেলেই হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ
নাকি সুরে,
কাঁদে এবং ডাকে তাদের
মাকে দূরে।

ছোটোবেলার স্মৃতি

মো. ফিরোজ খান

যখন আমি খোকা ছিলাম
ছিলাম ভালো বেশ,
খোকা হয়েই বাবার কাছে
বায়না ছিল অশেষ।
লাগবে ঘুড়ি, নাটাই সুতো
লাগবে লুডু, খেলনা গাড়ি,
সবুজ জামা দিতেই হবে
নইলে করব আড়ি।
কিশোর বেলার সে দিনগুলো
আসবে না আর ফিরে,
তাই তো এখন স্বপ্ন দেখি
সে সব স্মৃতি ঘিরে।

পণ

মো. আবির হোসেন

এসো সকলে মিলেমিশে
করি একটি পণ
সোনার বাংলাদেশ গড়ব মোরা
দিয়ে সুন্দর মন।

অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি
আছে যত কালো
বন্ধ করে দিয়ে সব
জ্বালিয়ে দিব আলো।

৭ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

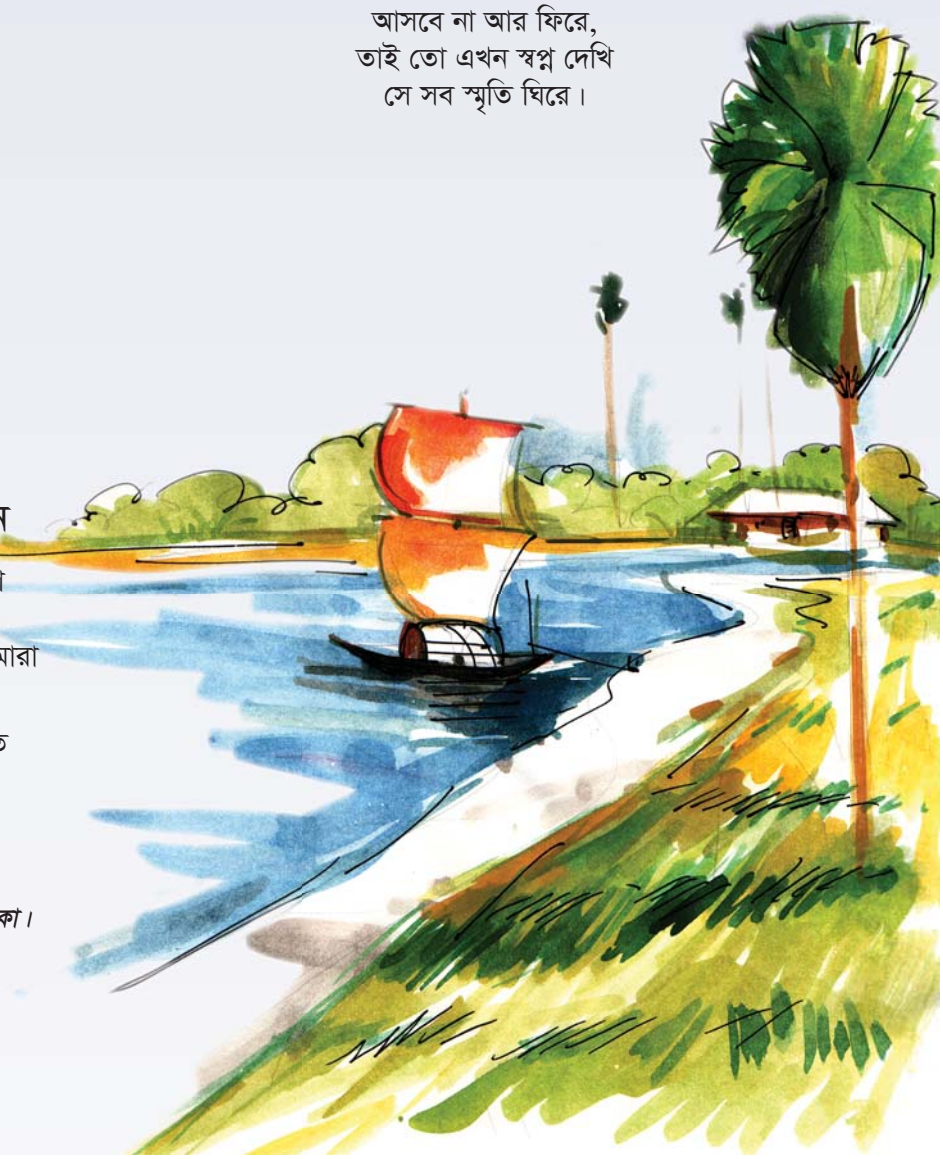

ভ্রমণ গল্প

হাফিজ উদ্দীন আহমদ

কদিন ধরেই প্রচণ্ড শীত। আজ আবার কুয়াশায় গাছপালা ঢেকে গেছে। প্রায় সকালেই বৃষ্টি। রাস্তাঘাট ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে। এর মাঝেই আবার রোদের ঝিলিক। ঘরে বসে কিছু টের পাওয়া যায় না। রোদ দেখে বিভ্রান্ত হই। ভাবি আজ হয়ত গরম হবে। এখনো তো শীত শুরু হয়নি। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর এখানে শরৎকাল। আমার মেয়ে পার্ল আর ওর স্বামী দারা ফার্নিচার কিনতে যাবে। ওদের মেয়ে ফাইহার জন্য সুন্দর একটা রিডিং টেবিল দরকার। ইচ্ছে করেই দেরি করে বের হলাম সবাই ঠান্ডা এড়াবার জন্য। আমার নিয়ত ওদের সাথে বাইরে একটু ঘুরা। বেলা বারোটা এখন। কিন্তু দরজা খুলে বের হতেই টের পাই শীত। হু হু করে বয়ে যাওয়া শীতল বাতাস হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। দারা আমার কাবু হওয়া অবস্থা দেখে বলে—

: আব্বা, আগেই বলেছিলাম আপনাকে ওভারকোট গায়ে দিয়ে বের হতে !

মৃদু ভর্ৎসনা করে তাড়াতাড়ি সে ঘরে ছুটে গিয়ে ওভার কোট নিয়ে আসলো।

গাড়িতে বসে আর কিছু টের পেলাম না। হিটার চলছে। দারার হাতে প্রাণ পেয়ে ওর কালো রঙের হোন্ডা এগিয়ে চলল। পার্ল পিছনের সিটে। ফাইহা ও তার ছোটো ভাই রাইয়ান সাথে নেই। ওরা এখন স্কুলে। এমনকি পৌনে তিন বছরের রিদওয়ান যে দুটা-তিনটা শব্দ ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না সেও আন্ডার ফাইভ স্কুলে। ছুটির দিন প্রতিদিন তিন ঘণ্টা থাকে সে সেখানে। টিচাররা দারুণ আদর করে। রং-বেরঙের খেলনা দিয়ে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে ওকে নিয়ে খেলে। কথা বলা, ছড়া ইত্যাদি শেখায়।

দেখতে দেখতে সুপার মার্কেটে চলে এলাম। এটা কেন্টের ফোগারেস ওয়ে রোডে। বিশাল বিল্ডিং। লন্ডনসহ বিভিন্ন জায়গায় এর শাখা আছে। এটা হলো হোম সেকশন। নাম জন লুইস এট হোম। সোম থেকে শুক্র সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা, শনিবার

সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা আর রবিবার সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। পার্কিং এলাকায় খালি জায়গা পাওয়া দুষ্কর। কয়েকটা অবশ্য খালি আছে। ওখানে হুইলচেয়ার-এর ছবি আঁকা। ওগুলো ইনভ্যালিড কার পার্কিং। যে সব প্রতিবন্ধী লোক গাড়ি চালিয়ে আসে তাদের জন্য। ওদের তিন চাকার মিনি মোটর সাইকেলের মতো ব্যাটারি চালিত ছোটো বিশেষ যান আছে। শেষ পর্যন্ত একটা জায়গা পাওয়া গেল। পার্কিং-এ ঢুকার সময় লুকানো সিসি টিভিতে গাড়ির নম্বরও এন্ট্রি হয়ে গেছে। এই শপিং সেন্টার থেকে বাজার করলে কোনো পার্কিং চার্জ দিতে হয় না। কিন্তু TESCO, ASDA, LIDL বা অন্যান্য শপিং সেন্টার থেকে বাজার করলে কোথাও এক ঘণ্টা, কোথাও দুই ঘণ্টা পর্যন্ত ফ্রি পার্কিং। তবে গাড়ি রেখে শপিং না করলে বা নির্ধারিত ফ্রি সময়ের বেশি গাড়ি রাখলে নব্বই পাউন্ড পর্যন্ত জরিমানা বা চার্জ হতে পারে। অন্যদিন গাড়ি পার্কিং-এর পরই ট্রলি নিতে যেতে হয়। অসংখ্য ট্রলি একটার পিছনে আরেকটা লাগিয়ে রাখা হয় ছোটো চেইন দিয়ে। ট্রলির হাতলের পিছনে যে ফুটো আছে তা দিয়ে এক পাউন্ডের একটা কয়েন ঢুকিয়ে দিলেই সামনের ট্রলির সাথে আটকিয়ে রাখা চেনটা খুলে যায়, আবার বাজার শেষে খালি ট্রলি তার স্ট্যান্ডে রেখে অগ্রবর্তী ট্রলির সাথে ঝুলতে থাকা চেনটি ব্যবহৃত ট্রলির নির্দিষ্ট ছিদ্রে ঢুকিয়ে দিলেই কয়েনটি বের হয়ে আসে। অন্যদিন যে সব বিশাল সুপার মার্কেটে আসি তার ভিতরে থাকে বিস্তৃত সব আলাদা জোন। কোনো এলাকায় থাকে টিন ফুড, কোথাও সবজি, কোথাও মেয়েদের অলংকার, কোথাও পোশাক, কোথাও বা মাছ -মাংস, ফলমূল, গৃহস্থালির জিনিসপত্র : হাঁড়িপাতিল, চাকুচামচ, তালা, স্ক্রু ড্রাইভার, জুতা, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি। একপাশে থাকে আবার কফি শপ। অর্ডার দিলেই পছন্দমতো উপকরণ দিয়ে পিৎজা বানিয়ে দেয়। কিন্তু আজকের এ মার্কেট অন্য ধাঁচের। এটা হোম বা ঘর বাড়িতে ব্যবহারের নানারকম জিনিসে পূর্ণ। কদিন থেকেই টেবিল খোঁজা হচ্ছে ফাইহার জন্য। সেজন্যই এখানে আসা। ভিতরে ঢুকেই বিশালত্ব দেখে অবাক হলাম। শুরুতে বিভিন্ন মডেলের মোবাইল টেবলয়েট, ল্যাপটপ। একপাশে দৈত্যাকার এলইডি টেলিভিশন, বাথরুম ফিটিংস ও এক্সেসরিজ। অল্প দূরে নানা ধরনের ক্যামেরা, তারপর বিভিন্ন আকারের আকর্ষণীয় বিছানা এবং বেডরুমের আসবাবপত্র। বিছানা চাদর, পর্দা, সোফাসেট, ওয়্যারড্রব, শো-কেস, বিভিন্ন ধরনের বাতি, ছবি, আয়না, দেয়াল ঘড়ি, রান্নার আসবাবপত্র, তোয়ালে, ওয়ালপেপার, ডোর ম্যাট। এছাড়া সামনের দিকে ছাত্রছাত্রী ও অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরনের সরঞ্জাম। এক জায়গায় দেখি বড়ো বড়ো করে ইংরাজিতে হ্যালোউইন (Halloween) লেখা। হ্যালোউইন অর্থটা ঠিকমতো বুঝলাম না। পার্লকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল—

: আব্বা, এগুলো ভূতের জিনিস।

: ভূতের জিনিস মানে ?

: এখানে হ্যালোউইন ডে মানে ভূত দিবস পালন করা হয়।

বিলাতে ভূত দিবস? এখানকার লোক ভূতে বিশ্বাস করে? শুধু তাই নয়, আবার দিবসও পালন করে? আকাশ থেকে পড়লাম আমি। তাকিয়ে দেখলাম হ্যালোউইন কথাটার নীচে তারিখও লেখা আছে – ৩১শে অক্টোবর। সামনে হ্যালোউইনের জিনিসগুলো সাজানো। ভয়ংকর দর্শন বিকট কালো মাকড়সা অর্থাৎ বিষাক্ত ব্ল্যাক স্পাইডার, মিনিয়েচার কঙ্কাল, কঙ্কালের মুখ আঁকা মুখোশ, দাঁত কেলিয়ে থাকা ভূতের জ্যাকেট ইত্যাদি। অন্যান্য সুপার মার্কেটগুলোতে আরো পাওয়া যায় বিশাল মিষ্টি কুমড়ো। তাতে আবার ভূতের চোখ-নাক-মুখ তৈরি করা থাকে, শিশু কিশোর থেকে শুরু করে বয়স্ক পুরুষ ও নারীর নানা ধরনের ভয় লাগানো পোশাক, এমন কী ভূতের ছবি আঁকা বিস্কুট এবং ক্যান্ডিও।

হ্যালোউইনের আর কদিন মাত্র বাকি। পার্ল নিজে খুব ভীতু। তারপরও সে একটা বড়োসড়ো ভয়ংকর দর্শন ব্ল্যাক স্পাইডার কিনল। মনে হয় ঘরে সাজিয়ে রাখবে।

আমাদের দেশে ছোটোদের কাছে ভূতের গল্পগুলো খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু তারা জানে আসলে ভূত বলে কিছু নেই। পড়তে মজা আর শিহরণ লাগে বলেই তারা এসব বই পড়ে। তাই বলে কী কেউ ভূত নিয়ে মাতামাতি বা দিবস পালন করে? বিলাতের মতো পৃথিবীর সর্বোন্নত দেশে ভূত দিবস পালন করার ব্যাপার সত্যি আমাকে অবাক করল। ৩১শে অক্টোবর হলো অলসেইন্টস ডের

পূর্ব সন্ধ্যা। এ দিনই এটা পালন করা হয়। বাইবেলে এ বিষয়ে তেমন কোনো উল্লেখ নেই। এর সাথে কুমড়োর কী সম্পর্ক তা সঠিক জানা গেল না। তবে এ দিনে কুমড়ো -কদু ইত্যাদির শাঁস বের করে তার খোলে বাতি জ্বালিয়ে লণ্ঠন তৈরি করা হয় বা সেগুলোর গায়ে কিম্ভূতকিমাকার নাক মুখ এঁকে ভূত বানানো হয়। ১৯০০ বছর আগে এটা ব্রিটেনে চালু হয়েছে। এদিন প্রাইমারি স্কুলগুলো বন্ধ থাকে। শুধু ব্রিটেন নয় আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত ইউরোপীয় দেশেও হ্যালোউইন পালিত হয়। আজকাল আমাদের দেশের বহু লোক ইউরোপ-আমেরিকা যাচ্ছে। ফলে এর প্রভাব উচ্চবিত্তদের মাঝে পড়েছে। বনানী -গুলশানে কোনো কোনো বাঙালিও এ দিবস ঘটা করে পালন করে। খোদ আমেরিকায় হ্যালোউইন উদ্‌যাপন করতে নাকি প্রতি বছর পাঁচ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়। কথিত আছে, এটা প্রাচীনকালের সেলটিক ফসল কাটার উৎসব যাকে ওরা সামহায়িন (Samhain) বলত। তা থেকেই এটার উদ্ভব। বিশ্বাস করা হয় এদিন ভূত-প্রেত-ডাইনিরা সানন্দে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় এবং সুযোগ পেলে মৃতের আত্মা বা ভূত জীবিতদের দেহে ঢুকে যেতে পারে। তারা পৃথিবীর বেঁচে থাকা লোকদের সাথে তামাশা করে, ভয় দেখায় এবং কখনো বা ক্ষতি করে। এটা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় তাদেরকে মজার খাবার ও মিষ্টান্ন খেতে দেওয়া। এদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে মানুষ নিজেই সেদিন তাদের মতো একজন ভূত সেজে ছদ্মবেশ ধারণ করে। তার ফলে আসল ভূতরা তাদেরকে নিজেদের স্ব-গোত্র মনে করে তার কোনো ক্ষতি করে না। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের এ প্রথা প্রচলিত ছিল। সেখানে লতাগুল্মের ফলের দেবি পোমোনুর ভোজ উৎসব পালন করা হতো। ল্যাটিন শব্দ পোমুন (Pomun) মানে হলো ফল। আজকাল অবশ্য ফলের বদলে ক্যান্ডি দেওয়া হয়। এত ফল কোথায় পাওয়া যাবে। রাতের অন্ধকারে ভূত সেজে একে অপরকে ভয় দেখায়। ছোটো ছেলেমেয়েরা ভূত সেজে বাড়ি বাড়ি যায় আত্মার কেক (Soul cake), হ্যালোউইন ক্যান্ডি ও মোমবাতি নিয়ে। সেই সাথে গান গেয়ে তারা পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করে। চারদিক উৎসবমুখর হয়ে উঠে।

হ্যালোউইন সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে জানতে

ফার্নিচার কর্নারে এলাম আমরা। কিন্তু ব্যাটে বলে মিলল না। টেবিল পছন্দ হয় তো দামে পছন্দ হয় না, দাম পছন্দ হয় তো টেবিল পছন্দ হয় না। এখানেও নানা ঘরবাড়ি সাজানোর জিনিস। পেট আস্তে আস্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। মোবাইলে তাকিয়ে দেখি বেলা দুটা পার হয়ে গেছে। আমরা দোতলায় উঠে রেস্টুরেন্টে আসলাম। প্রায় অর্ধেক ফ্লোর জুড়ে এটা। পার্লের গায়ে সাদা রঙের কোট, মাথায় হিজাব। সে আর দারা টেবিলে আমার বিপরীতে বসল। পাশের দেয়ালটা স্বচ্ছ কাচের। তা দিয়ে বাইরের এসফোর্ড শহর আর গাছপালা নজরে আসছে। এটা হালাল রেস্তোরাঁ নয় তাই হালাল ফুড খোঁজা বাতুলতা। সুতরাং মাংসের সব আইটেম বাদ দিয়ে মেনু দেখে ফিশ-বিনের স্যান্ডউইচ নিল ওরা। সঙ্গে সালাদ। স্যান্ডউইচে প্রচুর ক্রিম দেওয়া থাকে তাই আমি তা বর্জন করে নিলাম রোস্টেড পটেটো। সাথে বিনস। সেলফ সার্ভিস। দাম চুকিয়ে নিয়ে আসতে হলো সব। টেবিলে এনে দেখি রাজহংসীর ডিমের মতো বিশাল আকারের গ্রিল করা আলু। তার উপর গ্রেভি দেওয়া, সেই সাথে বিনস ও সালাদ। খাওয়া শেষে টেবিল পরিষ্কার করে নিজের প্লেট নিজেই জমা দিয়ে আসতে হলো কাউন্টারে। এটাই এ দেশের নিয়ম। এবার ওরা দুধ -ক্রিম দেওয়া ফেনা উঠা বিরাট রাজকীয় কাপ ভরা কফি খেল। আমি কফি খাই না তাই কোমল পানীয় নিলাম। বের হবার আগে হঠাৎ খেয়াল করলাম আরে ক্রিসমাস ট্রি না! হ্যাঁ, তাই তো। চার-পাঁচটি ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে মার্কেট থেকে বের হবার এলাকাটা সজ্জিত। ওগুলোতে দিনের বেলায়ও ছোটো ছোটো রং-বেরঙের বাতি জ্বলছে। গাছের পাতায় আবার ক্রিসমাস কার্ড ঝুলানো। অদূরে অনেকগুলো তাক। তাতে বিক্রয়ের জন্য রাখা অসংখ্য বিভিন্ন আকারের নানা ডিজাইনের বাতি। আজ ২০১৮-এর মাত্র ৪ঠা অক্টোবর। বড়ো দিনের অনেক দেরি কিন্তু এখনি তার বাতাস বইতে শুরু করেছে এ দেশে।

রাত দশটায় আমি রোজকারের মতো ঘুমুতে গেলাম। দোতলায় আমার থাকার ব্যাবস্থা। এসফোর্ডের ওয়াই গ্রাম সন্ধ্যা হতেই ঘুমিয়ে পড়ে। গাড়ি-ঘোড়া তেমন নেই। লোক সংখ্যাও কম। দারা বিকাল সাড়ে তিনটা -চারটায় তার অফিসে চলে যায়, রাত বারোটা সাড়ে বারোটায় ফিরে। আমি অন্য দিন যখন ঘুমুতে যাই তখনো পার্ল নীচে ড্রইংরুমে টিভি দেখে। তবে সদ্য এগারো বছর পূর্ণ করা মেয়ে ফাইহা এবং নয় বছর পূর্ণ করা ছেলে রাইয়ান হোম টাস্ক নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওরা এখানকার গ্রামার স্কুলে পড়ে। স্কুলে খুব কড়াকড়ি। প্রতিদিন ইন্টারনেটে শিক্ষকরা হোম টাস্ক পাঠিয়ে দেয়। সেগুলো খুঁজে বের করে বাড়ির কাজ শেষ হলে ওরা ঘুমুতে যায়।

সাড়ে দশটায় চোখটা একটু লেগে আসতেই আব্বু আব্বু চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসতেই দেখে পার্ল আতংকিত চোখে দৌড়ে ঘরে ঢুকেছে।

: কী, কী হয়েছে মা?

দেখি ওর চোখে-মুখে উদ্বেগ। অনেক কষ্টে ঢোক গিলে কোনোমতে সে বলল

: তোমার কাছে যে স্টেথোস্কোপ আছে সেটা নিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে আসো।

এক রকম দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। আল্লাহ জানেন কী বিপদ ! নামতে নামতে জানলাম ফাইহা ও রাইয়ান এক মনে রাত জেগে ড্রইংরুমে হোমওয়ার্ক করছিল। পার্ল মজা করতে ওদের সামনে আজ কিনে আনা সেই বিরাটাকার কালো মাকড়সাটা হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছে। দুজনেই ভয়ে আর্তচিৎকার করে ভিমরি খেয়ে অজ্ঞান হবার অবস্থা। রাইয়ান নাকি লুটিয়েই পড়েছিল। পার্লের মনে হয়েছিল ওর হার্টবিট খুঁজে পাচ্ছে না। কাছে গিয়ে দেখি ততক্ষণে একটু সামলে নিয়েছে দুজনে। হেঁচকি তুলে প্রচণ্ড কাঁদছে ওরা। চোখে-মুখে দারুণ আতংক। আমি উভয়কে বুকে চেপে ধরলাম।

: কচি শিশুদের এমন করে ভয় দেখাতে নেই !

মৃদু ভর্ৎসনা করলাম পার্লকে। আরেকটু হলেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে মর্মান্তিক পরিণতি হতে পারত। ঘটনার আকস্মিকতায় পার্ল হতভম্ব। হ্যালোউইনের আগেই হ্যালোউইন পালন করে ফেলেছে সে। বার বার ক্ষমা চাইতে লাগল সে নিজ সন্তানদের কাছে। ■

নিবন্ধ

ভাষা-দাদুর সঙ্গে

এসব শব্দ ব্রাজিলেও আছে!

তারিক মনজুর

পাউরুটি, আনারস – এসব শব্দ নাকি ব্রাজিলের ভাষাতেও আছে! ভাষা-দাদুর কথা শুনে ওদের বিশ্বাস হতে চায় না। নেহা জানতে চায়, 'তাহলে দাদু ওখানকার মানুষ বাংলায় কথা বলে নাকি?' স্কুল ছুটি হয়েছে খানিকক্ষণ আগে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা যার যার বাড়ির পথ ধরেছে। নেহা, বিনু আর পিলটু একটা আতা গাছের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

বিনু কোথা থেকে লম্বা একটা লাঠি জোগাড় করল। বলল, 'এটা দিয়ে আতা পাড়া যাবে।' কিন্তু পিলটু আমতা আমতা করে বলল, 'অন্যের গাছের ফল ...।' আরেক জনের গাছের ফল, না বলে পাড়া ঠিক হবে কী হবে না – এ নিয়ে তর্ক চলছিল। তখন ওদিক দিয়েই যাচ্ছিলেন ভাষা-দাদু। তিনি ওদের অবস্থা দেখে একটু দাঁড়ালেন। বললেন, 'কী হচ্ছে, শুনি! পর্তুগিজ মিয়াকে পাড়া হচ্ছে বুঝি?' ভাষা-দাদুর কথা কেউ ভালো মতো বুঝল না।

গাছটা মুলব চাচার। সবাই তাকে মুলব মিয়া বলে। কিন্তু এখানে পর্তুগিজ মিয়া আবার কোত্থেকে এল? বিনু খানিক অবাক হয়েই বলল, 'পর্তুগিজ মিয়াকে কোথায় পেলে, ভাষা- দাদু?' ভাষা-দাদু গাছের আতার দিকে নিজের লাঠিটা তুলে ধরলেন। বললেন, 'ওই আতার কথাই বলছি।' 'কিন্তু দাদু, আতাকে তুমি পর্তুগিজ মিয়া বলছ কেন?' পিলটু জানতে চাইল।

পিলটুর কথার উত্তর না দিয়ে দাদু গড়গড় করে কিছু শব্দ বলতে শুরু করলেন – 'আতা, আচার, আনারস, আলকাতরা, আলমারি, কেদারা, গামলা, চাবি, জানালা, পাউরুটি, পেরেক, ফিতা, বারান্দা, বালতি, বাসন, সাবান... 'এগুলোর মানে কী, দাদু?' বিনু থামিয়ে দিলো ভাষা-দাদুকে। ভাষা-দাদু বললেন, 'এসব শব্দ পর্তুগাল থেকে বাংলাদেশে এসেছে।'

'এক দেশের শব্দ আরেক দেশে যায় নাকি?' বিনু জিজ্ঞেস করল। 'খুব যায়!' ভাষা-দাদু বললেন, 'এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যোগাযোগের কারণে এমন হয়। এক ভাষার শব্দ আরেক ভাষায় খুব সহজেই ঢুকে পড়ে। ... এই যেমন এই শব্দগুলো ব্রাজিলের মানুষও ব্যবহার করে।' নেহা ঠিক তখনই জিজ্ঞেস করেছিল, 'তাহলে, দাদু, ওখানকার মানুষ বাংলায় কথা বলে নাকি?' দাদু এবার হাসেন।

বলেন, 'না, ব্রাজিলের মানুষ বাংলা বলবে কেন? ... ওই যে বললাম, দু-দেশের মানুষ এক জায়গায় হলে এরকম ব্যাপার ঘটতে পারে।' 'ও বুঝেছি,' পিলটু বলে, 'পর্তুগালের রোনাল্ডো আর ব্রাজিলের নেইমার একসঙ্গে হয়েছিল। আর রোনাল্ডো কয়েকটা শব্দ নেইমারকে দিয়েছিল। তাই না?' পিলটুর কথা শুনে নেহা আর বিনু এ-ওর দিকে তাকায়। ভাষা-দাদু মাথা নেড়ে বলেন, 'ব্যাপারটা মানুষের দ্বারাই হয়। তবে এটা কেবল দুজন মানুষের ব্যাপার না।

... আসলে অনেকদিন ধরে অনেক মানুষের যোগাযোগের কারণে এমন হয়। মানে, এক দেশের শব্দ আরেক দেশে চলে যায়।' 'তার মানে পর্তুগালে মানুষ আমাদের দেশে এসেছিল!' নেহা বলে। 'ঠিক তাই!' ভাষা-দাদু বলেন, 'পর্তুগিজরা এদেশে এসেছিল। সেটা প্রায় পাঁচশ বছর আগের কথা। শুধু এসেছিল বললে কম বলা হবে। তারা অনেকদিন এখানে থেকেও ছিল। ' 'ওরে বাবা!' বিনু বলে, 'এখানে আসার রাস্তা ওদেরকে কে চিনিয়েছিল শুনি?'

ভাষা-দাদু হাসতে হাসতে বলেন, 'ভাস্কো-দা-গামা নামের এক পর্তুগিজ নাবিক ছিলেন। তিনি ১৪৯৮ সালে প্রথম ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে ভারতে আসেন।' 'পর্তুগিজরা তবে ব্রাজিলেও গিয়েছিল। তাই না?' পিলটু প্রশ্ন করে। 'হ্যাঁ, তাই!' পিলটুর কথায় দাদু খুশি হন, 'পর্তুগিজরা ব্রাজিলে দীর্ঘকাল শাসন করেছে। এর ফলে এক সময় ব্রাজিলের নিজেদের ভাষা গিয়েছে হারিয়ে। আর পর্তুগিজ ভাষা হয়েছে ওদের প্রধান ভাষা।'

'ওরে বাবা! ভাষাও হারিয়ে যায়?' বিনু বিড়বিড় করে বলে। দাদু ওর কথা শুনে ফেলেন। বলেন, 'হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটবেই, এমন কোনো কথা নেই।

পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড থেকে লোকজন এ অঞ্চলে এসে অনেকদিন থেকেছে। শাসন করেছে। তাই বলে বাংলা ভাষা কিন্তু হারিয়ে যায়নি।' 'কিন্তু, দাদু, আমরা যে ওদের শব্দ ব্যবহার করছি!' নেহা একটু মন খারাপ করেই বলে। 'তাতে কী! এক ভাষার কিছু শব্দ আরেক ভাষায় আসতেই পারে। এটা দোষের কিছু নয়।

ইউরোপীয়রাও তো আমাদের অনেক শব্দ ব্যবহার করে।' 'তাই নাকি!' ওরা খুব অবাক হয়। নেহা বলে, 'বলো না, দাদু, এরকম কয়েকটা শব্দ!' ভাষা-দাদু বলেন, 'এখন রোদ খুব চড়ে গিয়েছে। বিকালবেলা এখানেই আবার এসো। তখন বলা যাবে।' 'এখানে কেন, দাদু?' বিনু বলে। ওর হাতে তখনও আতা পাড়ার জন্য লাঠি। 'বিকালে দেখি মুলব মিয়াকে বলে। তখন যদি দু-একটা পর্তুগিজ মিয়াকে পাড়া যায়!' এই বলে দাদু গাছের আতার দিকে আরেকবার নিজের লাঠিটা তুলে ধরলেন। ■

সাহসী ছেলে

নাসিম সুলতানা

সবেমাত্র এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সজলের হাতে এখন অনেক সময়। গল্পের বই পড়া, ঘুরে বেড়ানো, খেলাধুলা করে সময় পার করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। ঐদিন মা বললেন-দূরের জমিগুলোতে তো তোর দাদার সাথে ঘুরে দেখে আসতে পারিস।

টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় সজলদের বাড়ি। মায়ের কথা সজলের কানে গেল না। তারা বন্ধুরা মিলে চিন্তা করছে কী করা যায়। এমন সময় তার বন্ধু কমল এসে বলল, ইছাপুরের পাশে সুরুজ গ্রামে ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাবে। ব্যাস, যেমন কথা তেমন কাজ। বন্ধুরা সবাই মিলে খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল। যাদের সাথে খেলবে তারা খুব ভালো খেলোয়াড়।

সজল বলল শোন, আমাদের খুব ভালোভাবে খেলতে হবে। এটা একটা মানসম্মানের প্রশ্ন।

পরদিন সকালে ওরা ১১ জন বন্ধু ফুটবল ম্যাচ খেলতে রওনা দিল। খেলতে যাওয়ার ব্যাপারে সজলের মায়ের মত ছিল না।

কিন্তু দাদা বললেন, না... না... খেলতে নিষেধ করবা না। লেখাপড়া জ্ঞানের জন্য দরকার আর শরীর ঠিক রাখার জন্য খেলাধুলা দরকার।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা করছে। কমল বলল, দোস্ত, আকাশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হতে পারে। রাশেদ বলল, বৃষ্টি হলে কী হবে ? বৃষ্টির দিনে আমরা ওপাড়ার সুলতানদের সাথে খেলে জিতেছি না।

যাক তারা কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল। পথে তাদের গ্রাম ফেলে মাঝখানে একটি গ্রাম। তারপর ইছাপুর কবরস্থান পার হয়ে একটা বটগাছ। তারপরের গ্রামে তারা খেলতে গেল।

বৃষ্টির কারণে খেলা দেরিতে শুরু হলো। খেলা শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। খেলায় সজলের দল হেরে গেল। এমনিতেই খেলায় হেরে গেছে। তার উপর প্রচণ্ড খিদে –সব মিলিয়ে মন খারাপ করে বাড়ির পথে রওনা দিল তারা। তখনো ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি চারদিক আলো করে আবার অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে।

বাড়ি থেকে তারা চারটা সাইকেল এনেছিল। কিন্তু কাদামাটিতে রাতের অন্ধকারে সাইকেল চালানো অনেক কঠিন হয়ে যায়। তাই তারা হেঁটেই রওনা দিল।

এদিকে খেলায় হেরে যাওয়ার কারণে এবং বৃষ্টি সব মিলিয়ে যারা খেলতে নিয়ে ছিল তারা সাইকেলের কোনো খোঁজই নিল না। প্রচণ্ড খিদায় যেন পা আর চলে না। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারা অনেকটা পথ চলে এসেছে। সামনে ইছাপুর কবরস্থান। তারপর একটি গ্রাম পার হলেই তাদের গ্রাম। তখনও আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি কমেনি। মাঝে মধ্যে মেঘের

ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের ঝলকানিতে তাদের পথ চলতে চলতে আশপাশে কী আছে তা দেখা যাচ্ছে। আবার যখন অন্ধকার তখন টর্চের আলোয় তাদের পথ চলতে হচ্ছে। হঠাৎ কমল চিৎকার করে বলল, সজল দ্যাখ...দ্যাখ। ঐ যে কবরস্থানে সাদা মতো কী দেখা যাচ্ছে বলে সে তোতলাতে লাগল। ওটা নিশ্চয়ই ভূত। আমি তোদের এত করে বললাম— যে আজকে রাতখানা আমরা পিসির বাড়িতে থেকে কালকে ভোরে বাড়ি রওনা দেই। তা তোরা শুনলি না। ও মাগো বাঁচাও। ওটা নিশ্চয়ই ভূত।

ওর দেখাদেখি রবি, জিতু, স্বপন, কাজল, রতন সবাই কান্নাকাটি শুরু করল। সজল ওদের ধমক দিয়ে বলল— তোরা চুপ করবি! তোদের চেঁচামেচি শুনে ভূত তোদের টুটি চেপে ধরবে।

সজল বলল, চল্ আমরা সকলে গিয়ে দেখি ওটা আসলে কী?

ওরা সবাই রাস্তার ধারে বসে পড়েছে। সজলের কথা শুনে বলল— আমাদের তো আর ভূতের ঘাড় মটকানো খাওয়ার সাধ হয়নি তোর ইচ্ছা হলে তুই একা যা।

সজল রবির হাত থেকে টর্চটা নিয়ে রাস্তার ঢাল দিয়ে নামতে শুরু করল। বন্ধুদের নিষেধ সে মানল না। ওদের থেকে সজলের সাহসটা একটু বেশি।

কিন্তু সজল ওদের সাহস দেখালো ঠিকই-কিন্তু নিচে নেমে তারও যে ভয় লাগছে না তা নয়। সে আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে কবরস্থানের কাছে আসতেই টর্চের আলো ও মেঘের বিদ্যুতের আলোতে যা দেখল –তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। একটা শিয়াল একটা সাদা কাপড় নিয়ে একবার এদিকে একবার ওদিক যাচ্ছে। তাকে দেখে শিয়ালটা পালিয়ে গেল।

এত ভয়ংকর বিপদে বন্ধুরা তখন হাসতে শুরু করল। সকলে মিলে সজলকে Bravo boy অর্থাৎ সাহসী ছেলে খেতাব দিলো।

তারপর বন্ধুরা পা চালিয়ে হাঁটা শুরু করল। ঘণ্টা দুই পর তারা সকলে বাড়ি পৌঁছালো। এই ভয়ংকর ঘটনাটা তারা আজও ভুলে নাই। ■

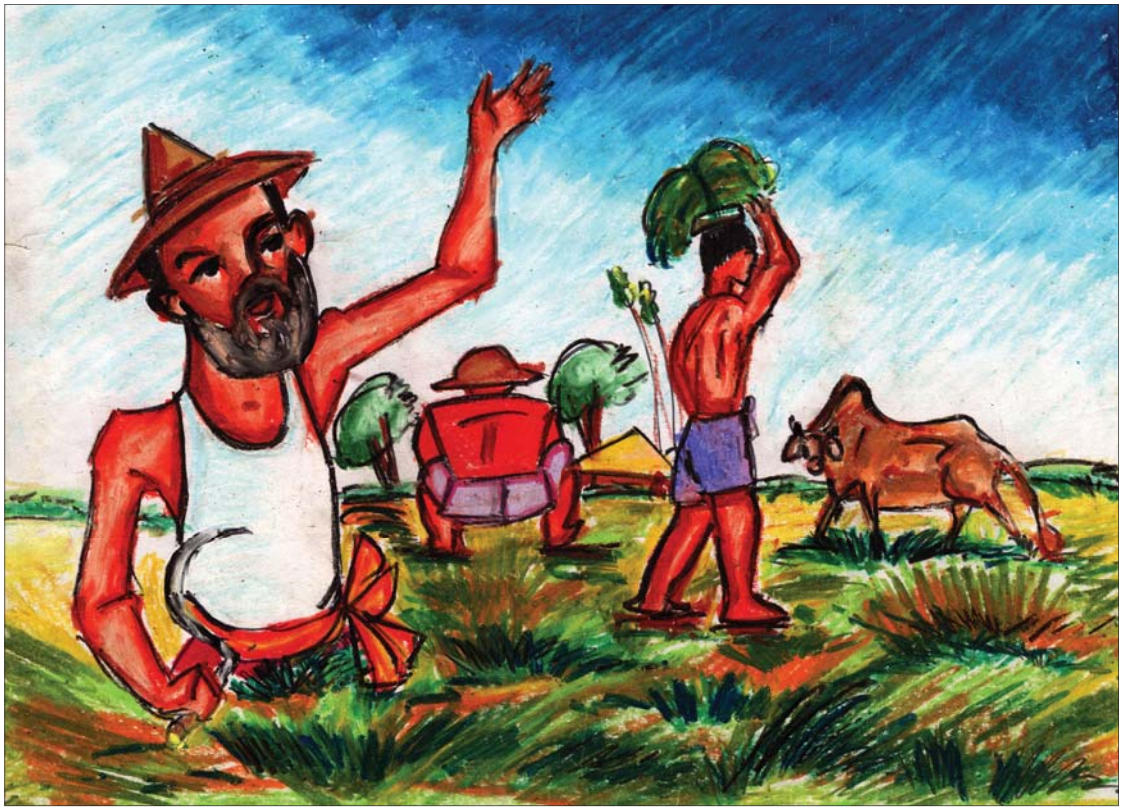

ইউসুফ হায়দার আদিব, অষ্টম শ্রেণি, উইলস্ লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জলপরির গল্প

সাবরিনা আক্তার

এক দেশে ছিল এক কাঠুরে। তার নাম হলো কাঠোরা। সে প্রতিদিন বনজঙ্গল থেকে গাছ কাটে। তার একদিন খুব পানির পিপাসা লাগল। সেখানে একটা পুকুর ছিল। সে পুকুরে গিয়ে পানি পান করল। পানি পান করার পর কাঠুরের সাথে এক পরির দেখা হলো। কাঠুরে বলে, এ কী দেখছি আমি? জলপরি বলে, ভয় পেয়ো না তুমি। আমার নাম জলপরি। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। জলপরি বলে তোমার নাম কী? কঠুরে বলল, আমার নাম কাঠোরা। তুমি এই গভীর জঙ্গলে কেন এসেছ। কাঠুরে বলে আমি খুব গরিব। এখান থেকে রোজগার করে আমার সংসার চালাতে হয়।

জলপরি কাঠোরার কষ্ট বুঝতে পারল। জলপরি বলে, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি? কাঠোরা বলে, তোমার আমার জন্য কিছু করতে হবে না। জলপরি বলে কেন? কাঠোরা বলে, আমি নিজেই নিজের সংসার চালাতে পারব। জলপরি বলে, আচ্ছা ঠিক আছে। আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু। যদি বিপদে পড় তাহলে আমাকে বন্ধু... বলে ডেকো। কাঠোরা বলে ঠিক আছে। একদিন কাঠোরা বিপদে পড়ল। কাঠোরা তখন বন্ধু... বলে ডাক দিল। তখন জলপরি চলে আসল। জলপরি তখন তাকে বিপদ থেকে বাচাঁল। সেই থেকে দুইজনে বন্ধু হয়ে গেল। ■

নেংটি এবং মিঁয়ো

কামাল হোসাইন

ইঁদুর মিয়ার সঙ্গে তো নেই বিড়াল মিয়ার ভাব–
আপোশ করে থাকলে হতো দুইজনেরই লাভ।
ইঁদুর করে কুটুর কুটুর বই কেটে সব সাফ–
বিড়ালটাকে দেখলে আগে মারত ভয়ে লাফ।

হাপিস করে বিড়ালটা দুধ-মাছের মুড়োগুলো–
মাংস হাঁড়ি মালাইকারি পেটের মধ্যে থুলো।
দুইজনেরই স্বার্থ একই খাওয়াটা ভরপেট–
খাদ্য পাবে খুঁজলে হাজার গুগল ইন্টারনেট।

সার্চ দিলে তো ছবিই আসে পেট ভরে না তাতে–
চিন্তা করে দুজন তারা বন্ধুত্ব হয় যাতে।
দেখলে বিড়াল ইঁদুর ছানার ছুট লাগানো কাজ
ইঁদুর ছানা ভাবল সেদিন ছুট দেবে না আজ।

ইঁদুর দেখে বিড়ালটা যেই আসছে নখর মেলে–
'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলল ইঁদুর শক্তি-সাহস ঢেলে।
ইঁদুর ছানার কাণ্ড দেখে থমকে দাঁড়ায় মিঁয়ো–
বিড়াল বুঝি ভিমরি খেল জপ করে সে 'ঞ'।

পরক্ষণেই ভাবতে থাকে বড্ড সাহস ওর–
এত্ত সাহস কোথায় পেল কাটছে না সেই ঘোর।
রগড়িয়ে চোখ, গোঁফ ফুলিয়ে বিড়াল তেড়ে আসে–
ওমা! এ কী, নেংটি ইঁদুর হা হা করে হাসে!

কী হলো তোর নেংটি ওরে নেই কি রে ভয় মোটে?
তোদের মতো সাহসীদের এমনি মরণ জোটে।
এবার তবে তৈরি হ তুই মটকাব তোর ঘাড়–
ভাবিসনে আর নেংটি ইঁদুর পেয়ে যাবি ছাড়।

এই না বলে দাঁত খিঁচিয়ে বিড়াল আগায় থাবা–
বলে, তোমার হাড্ডি খাব কোথায় চাঁদু যাবা?
তিড়িং করে লাফ দেয় ইঁদুর একটু দূরে সরে–
ইঁদুর-বিড়াল খেলা তখন উঠল জমে ঘরে।

বলল ইঁদুর, থামো ভায়া অমন কেন করো?
বুঝছ না ক্যান তোমায় দেখে কাঁপছি থরোথরো।
দুটি কথা বলব তোমায় কানটি করো খাড়া–
তুমি তো ভাই চোখটি বুজে কেবল করো তাড়া।

একটু যদি ভাবো তুমি বন্ধু হতে পারি–
তাই যদি হয় দুইজনেরই সুবিধা হয় ভারি।
কী বলেরে নেংটি পুটো
খাবো আগে চক্ষু দুটো
ভাঙব দুটো ঠ্যাং–
দেখব তখন কেমনে পালাস
আমায় দিয়ে ল্যাং!

ইঁদুর ধরে কান দুটো তার জিভ কেটে সে বলে–
অমন করে রাগ দেখালে চলে?
এমনিভাবে সারাজীবন দেখাও যদি রাগ গো–
ভাবব তবে আমারই দুর্ভাগ্য।
তারচে এসো দুজন করি সন্ধি–
কীসে ভালো সবার হবে সেই কথাতে মন দি।
লাভ কী বলো পরস্পরের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী?

বিড়াল ভাবে পুঁচকে ইঁদুর আমায় দেবে জ্ঞান!
কী কারণে শুনতে হবে কুটকুটে ঘ্যানঘ্যান?
বলে, ইঁদুর শোন–
খামোখা তুই আগড় বাগড় বকিস অকারণ।

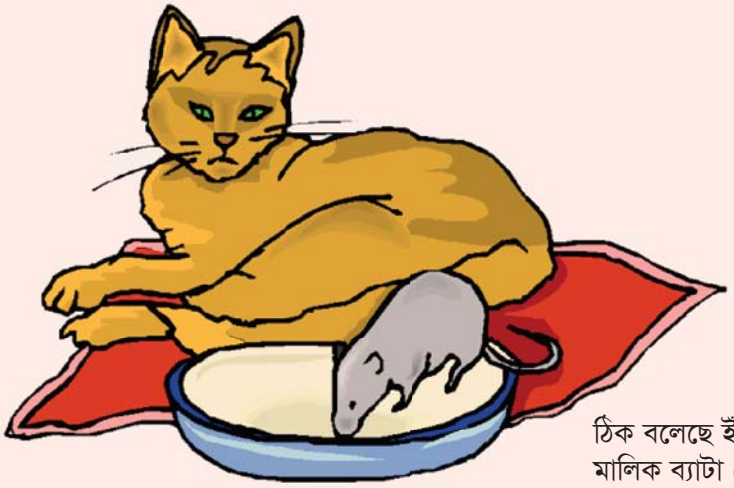

ইঁদুর বলে, ভায়া–
জানোই তুমি আঁতকে উঠি দেখলে তোমার ছায়া।
তারপরও ক্যান অমন করে আমায় দেখাও ভয়?
ছোট্ট আমি, আমার বলো জান কি ধড়ে রয়?

তুমি করো হাঁড়ি সাবাড় আমি গুদাম নষ্ট–
যার কারণে মালিক ব্যাটা পায় যে বড়ো কষ্ট।
সেই হিসেবে আমরা দুজন সমান দোষে দোষী–
তবুও কেন আমার উপর হও তুমি আক্রোশি?

ধরতে তোমায় দেয় লেলিয়ে লেজ নাচুনে ঘেউ–
তখন তোমায় রক্ষা করে কেউ?
সেই একই জন ওষুধ দিয়ে আমাকে চায় মারতে–
বলো তো কার স্বার্থে?

এতক্ষণে বিড়ালটা তার কথাতে হয় তুষ্ট–
কমিয়ে আনে মন থেকে সব রুষ্ট।
থাবার তলে নখর লুকোয় লেজ নাড়ানো বন্ধ–
নেংটো-পুটোর কথায় যে তার যায় কেটে সব দ্বন্দ্ব।

ঠিক বলেছে ইঁদুর ছানা ভুল বলেনি কিচ্ছু–
মালিক ব্যাটা যেমন তেমন তার ছেলেটা বিচ্ছু।
দেখলে আমায় লাথি মারে মারতে ছুটে আসে–
তাই তো থাকি দিনরাত্রি ত্রাসে।

অনেক করে ভেবে ভেবে বলল বিড়াল– বেশ
আজকে থেকে শত্রুপনা শেষ;
আয় দুজনে ভাগ করে খাই জিলিপি-সন্দেশ।

সেই থেকে সেই বিড়াল এবং ইঁদুর;
একসাথে শোয়, একসাথে খায়
যেইখানে যা দুইজনে পায়
ভাগ করে নেয় পেলে পরে কৌটো ভরা সিঁদুর।

ইঁদুর এখন বিড়াল মিয়ার গোঁফ ধরে দেয় টান–
বিড়াল করে গরর গরর হাসিতে আটখান।

ইঁদুর বিড়াল দুজন মিলে করে ছুটোছুটি–
ডিগবাজি খায়, সারাবাড়ি আর যে লুটোপুটি।
এখন দুজন বন্ধু তারা সদ্ভাবে দিন কাটে–
মাঠে গেলে যায় দুজনে ঘাটে গেলে ঘাটে।

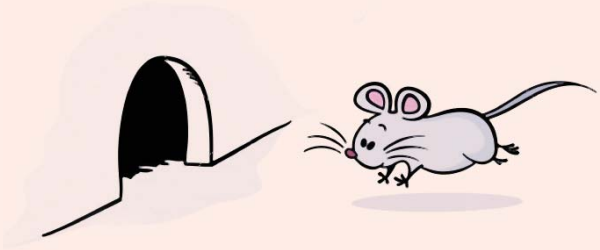

শিং ওয়ালা নারহোয়েল

অনিক শুভ

রূপকথার ইউনিকনের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি, ছবিও হয়ত দেখেছি। বাস্তবে ইউনিকনের দেখা না মিললেও এক শিংওয়ালা প্রজাতির প্রাণীর দেখা মেলে সমুদ্রে। এদের নাম নারহোয়েল। আসলে এটা মোটেই মিথলজিক প্রাণী নয়। এরা সত্যিই রয়েছে পৃথিবীতে। আর্কটিকের এক আইকনিক প্রাণী নারহোয়েল। শত শত বছর ধরে বিজ্ঞানীরা এদের পেছনে লেগে রয়েছেন। বিশাল আর্কটিকে তারা শীতকালের অন্ধকারে সময় কাটায়। এরা যে পানিতে থাকে সে পানিতে বরফ ভাসে।

নারহোয়েল মূলত এক প্রজাতির তিমি। এরা এদের শিঙের জন্যই বেশি বিখ্যাত। ড্রিল মেশিনের সূচের মতো পেঁচানো লম্বা এই অঙ্গটি আসলে নারহোয়েলের দাঁত বা শিং নয়। শুধুমাত্র পুরুষ নারহোয়েলেরই এই দাঁত গজায়। এদের দাঁত ২-৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এরা সাধারণত ছোটো আকারের প্রাণীদের ধরে খায়। কিন্তু এমন একটি দাঁত দিয়ে শিকার ধরে খাওয়া খুব কঠিন বলেই মনে হয়। অনেকে বলেন, নারহোয়েল তাদের খাবার চিবিয়ে খায়।

তবে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু নারী নারহোয়েলেরও এই দাঁত দেখা যায়। শুধুমাত্র এই দাঁতটিই লম্বায় ৯ ফুট পর্যন্ত হয় এবং ওজন হয় ১০ কেজি।

ঠিক কী কারণে নারহোয়েলদের এই বিশেষ দাঁত গজায় তার কারণ বের করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। ধারণা করা হয় নারী নারহোয়েলকে আকর্ষণ করতে এবং নিজেদের মধ্যে মারামারি বা নিজেদের রক্ষা করতেই এই দাঁতের দরকার হয়।

আর্কটিক মহাসাগরের বরফ ঢাকা পানিতে বরফের আস্তরণ ভাঙতেও প্রয়োজন হয় এই দাঁতের।

তবে আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করে নারহোয়েলের দাঁত। এই দাঁতে স্নায়ু রয়েছে এবং ছোটো ছোটো ছিদ্র রয়েছে যার মধ্য দিয়ে সমুদ্রের পানি ঢুকতে পারে। এর ফলে পানির সামান্যতম পরিবর্তনও যেমন পানির তাপমাত্রা বা লবণাক্ততার পরিবর্তনও বুঝতে পারে নারহোয়েল। এসব অনুভূতির কারণে নারহোয়েল তাদের শিকার সহজে খুঁজে পায় এবং পানিতে ভালোভাবে বাঁচতে পারে।

নারহোয়েল তিমির মতোই স্তন্যপায়ী প্রাণী। আর্কটিক মহাসাগরের গ্রিনল্যান্ড, কানাডা আর রাশিয়া অঞ্চলে দেখা যায় এদের। আকারে একটি প্রাপ্তবয়স্ক নারহোয়েল ১৩ থেকে ১৮ ফুট পর্যন্ত হতে পারে আর ওজন হয় ৮০০-১৬০০ কেজি।

দাঁতসহ এর চেহারা দেখে সবাই ভাবেন, নারহোয়েল ভয়ংকর একটা প্রাণী। কিন্তু অদ্ভুত হলেও সত্য যে, এরা লাজুক এবং ভীতু। বহুকাল ধরে এদের শিকার করছে মানুষ। তবে বর্তমানে এটি কমেছে। এখন শিকার এদের জীবনধারণে সমস্যা নয়। তবে শব্দদূষণ বড়ো ধরনের সমস্যা। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে আর্কটিকের বরফ গলছে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করছে। এতে যে শব্দ দূষণ হচ্ছে তা নারহোয়েলের জন্যে দারুণ ক্ষতিকর।

তবে এই মিথলজিকেল প্রাণীকে রক্ষায় যে-কোনো উপায় গ্রহণে প্রস্তুত বিজ্ঞানীরা। ■

অর্থবহ পতাকায় বাংলাদেশ

আনোয়ারুল হক

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক জাতীয় পতাকা। বিশ্বের যে-কোনো দেশের জাতীয় পতাকা নিজ নিজ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আত্মত্যাগের করুণ কাহিনি বহন করে। প্রত্যেক দেশের মানুষ তাদের জাতীয় অনুষ্ঠানে দেশের স্বতন্ত্র প্রতীক হিসেবে জাতীয় পতাকা ব্যবহার করেন। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বিশ্বের সেরা অর্থবহ পতাকার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এ তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, নেপাল এবং মালয়েশিয়ার পতাকা।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর ত্রিশ লক্ষ শহিদের এক সাগর রক্তের অর্জন বাংলাদেশের লাল–সবুজ পতাকা । আমাদের দেশের পতাকা বিশেষ অর্থ বহন করে। তাই তো স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের সেরা অর্থবহ পতাকার তালিকায়। এসো জেনে নেই তালিকাভুক্ত ১০ দেশের জাতীয় পতাকা সম্পর্কে।

বাংলাদেশঃ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রং লাল – সবুজ, এটি এদেশের প্রকৃতি ও তারুণ্যের প্রতীক। সবুজের মাঝে থাকা লাল বৃত্ত উদীয়মান সূর্য এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের রক্তের প্রতীক। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার এ নকশা ১৯৭২ সালের ১৭ই জানুয়ারি সরকারিভাবে অনুমোদিত হয়। প্রথম উত্তোলন হয় ১৯৭১ সালের ২ রা মার্চ। মূল ডিজাইনার ছিলেন শিব নারায়ণ দাশ আর বর্তমান পতাকার নকশাকার কামরুল হাসান। আয়তাকার এ পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ঃ৬। মাঝের লাল বর্ণের বৃত্তটির ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সরকারি বেসরকারি ভবন কূটনৈতিক মিশন ও কনস্যুলেটে পতাকা উত্তোলন করতে হয় এবং শোক দিবসে পতাকা অর্ধনমিত থাকে।

যুক্তরাজ্যঃ দেশটির 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামে পরিচিত বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন পতাকায় মূলত তিনটি ক্রস চিহ্ন রয়েছে। এই ক্রস তিনটি দেশের ধর্মযাজকদের প্রতিনিধিত্ব করে। আর মোটা লাল দাগ ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের সেন্ট জর্জের ক্রস, সাদা রং স্কটল্যান্ডের সেন্ট অ্যান্ড্রু ক্রস ও আড়াআড়ি লাল দাগ উত্তরাঞ্চলীয় আয়ারল্যান্ডের সেন্ট প্যাট্রিক ক্রস নির্দেশ করে। ১৮০১ সালে এ নকশার পতাকা গ্রহণ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রঃ যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পতাকার আরেক নাম 'দ্য স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপ' ।এই পতাকার নকশা অনেকবার পরিবর্তিত হয়ে ১৭৭৫ সালে বর্তমান রূপ ধারণ করে। এর ১৩টি আনুভূমিক লাল দাগ প্রথম ১৩টি রাজ্যকে নির্দেশ করে। পতাকার ৫০টি তারকা চিহ্ন ৫০টি প্রদেশের প্রতীক। লাল রং দৃঢ়তা ও বীরত্বের প্রতীক, আর নীল রং সতর্কতা ও ন্যায়বিচারের প্রতীক।

ফ্রান্স: ১৭৯৪ সালে ফ্রান্স নীল-সাদা-লাল রঙের পতাকা গ্রহণ করে। এর তিনটি রং ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ স্বরূপ স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। আর নীল ও লাল রং প্যারিসের প্রতীক। পতাকায় থাকা সাদা রং ফরাসি বিপ্লবের আগ পর্যন্ত ফ্রান্স শাসন করা বার্বন রাজবংশের সম্মানার্থে রাখা হয়েছে।

কানাডা: ১৯৬৫ সালে ম্যাপল পাতার নকশায় কানাডার বিখ্যাত পতাকা সরকারি ভাবে স্বীকৃতি পায়। ১১ কোণা বিশিষ্ট পাতাটি কানাডার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতীক। এছাড়া পতাকার লাল-সাদা রং আশা, উন্নতি, শান্তি ও নিরপেক্ষতার প্রতীক।

অস্ট্রেলিয়া: দেশটির পতাকার রং নীল। এতে তিন ধরনের প্রতীক দেখা যায়। বাম পাশে উপরে ব্রিটেনের পতাকা, এর নিচে সাত কোণা বিশিষ্ট সাদা তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতীক। এটিসহ মোট ছয়টি তারা ছয়টি রাজ্যের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা: ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা নেলসন ম্যান্ডেলার কারামুক্তি উপলক্ষে নতুন পতাকা ধারণ করে। ম্যান্ডেলার দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে পতাকার কালো, সবুজ ও লাল রং নেওয়া হয়েছে। ট্রান্সভাল রাজ্যের পুরোনো পতাকা থেকে লাল, সাদা ও নীল নেওয়া হয়েছে। আর ইংরেজি ওয়াই বর্ণের আকৃতি দেশটির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

ব্রাজিল: ব্রাজিলের পতাকার সবুজ অংশ দেশটির বিশাল বনভূমি ও শস্যক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। আর হলুদ ডায়মণ্ড আকৃতির চিহ্ন দেশটির স্বর্ণখনির প্রতীক। মাঝের বড়ো নীল রংটি পৃথিবী ও এর ওপর ২৭টি তারকা ২৭টি রাজ্যের প্রতীক। আর পৃথিবীর ওপর লেখা 'অরডেম ই প্রগ্রেসো', যার অর্থ শৃঙ্খলা ও উন্নতি।

নেপাল: দেশটির পতাকা কিছুটা ভিন্ন আকৃতির যা হিমালয়ের পর্বতচূড়া নির্দেশ করে। আর পতাকার নীল প্রান্ত শান্তির প্রতীক। পতাকায় থাকা লালচে রং দেশটির জাতীয় ফুল রোডোডেনড্রনের প্রতীক। আর আংশিক চাঁদ রাজ পরিবার ও সূর্য রানা পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে।

মালয়েশিয়া: পতাকার লাল, সাদা ও নীল রঙের অর্থ- দেশের জনগণ। হলুদ রঙের আংশিক চাঁদ ও তারা দেশটির রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলামের পরিচায়ক। হলুদ রংটি মালয় শাসকরা অন্য দেশের হাতে পরাধীন নয় এটি মনে করিয়ে দিচ্ছে। লাল-সাদা রঙের ১৩টি দাগ ১৩টি রাজ্যের প্রতীক। আর ১৪তম দাগ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রতীক। ■

তথ্যসূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম

ইয়াফি মুকসিত, শিশু শ্রেণি, মিস্টিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

লাল কলা

অর্ক রায় সেতু

শুনতে অবাক হলেও কলাটি দেখতে কিন্তু লাল।

কলা শরীরের জন্য বেশ উপকারী একটি ফল। কলা নিমিষে আমাদের শরীরের হারানো শক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার মূল উপাদানের সব কটি কলার মধ্যে রয়েছে। কলাতে প্রচুর পরিমাণে সুক্রোজ, ফ্রুকোজ এবং গ্লুকোজ রয়েছে। তাই দৈনিক খাবারের তালিকায় একটি করে কলা রাখা যায়। তবে সবচেয়ে চমৎকার আর মজার ব্যাপার হলো কাঁচা অবস্থায় কলা সবুজ থাকে এবং পাকতে শুরু করলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। তাই সচরাচর হলুদ কলার সাথে আমরা বেশ পরিচিত।

আবার কলা বিভিন্ন প্রজাতির হয় যেমন– বাংলা কলা, বন কলা, মামা কলা ইত্যাদি।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে প্রচুর কলা জন্মে। বাংলাদেশেও প্রচুর কলা চাষ হয়। আর এই কলাগুলোর রং হয় হলুদ। আমাদের প্রসঙ্গ কিন্তু লাল কলা নিয়ে। একটু অবাক লাগলেও কোস্টারিকায় কিন্তু লাল কলা আছে এবং বেশ জনপ্রিয়। লাল কলায় অন্য সাধারণ কলার চাইতে বেশি পরিমাণ ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার ও লবণ রয়েছে হলুদ কলার চাইতে এই কলা অনেক বেশি ভালো শরীরের জন্য। বিভিন্ন নাম রয়েছে এই লাল কলার। এরা মূলত মুসা আকুমিতা প্রজাতির কলা। কোস্টারিকা থেকে পূর্ব আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে লাল কলা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হয়। ■

শিশু নির্যাতনকারীদের ক্ষমা নেই: প্রধানমন্ত্রী

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

প্রতিটি শিশু যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে, তাদের জীবন যেন অর্থবহ হয় এটাই লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। প্রতিটি শিশুর জন্য সুন্দর ভবিষ্যতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আজকে যারা শিশু নির্যাতন বা শিশু হত্যা করে, তাদের কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা পেতে হবে। অবশ্যই পেতে হবে। এ ধরনের অন্যায় অবিচার কখনোই বরদাস্ত করা হবে না।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই অক্টোবর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ।

শেখ রাসেলের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, 'আমরা চাই আমাদের শিশুরা যাতে আর কখনোই এ ধরনের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার না হয়। প্রতিটি শিশু যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে। আর প্রতিটি শিশুর জীবন যেন অর্থবহ হয়। তা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।'

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ আয়োজিত সারাদেশের শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কণ এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলের জন্ম হয়। অমিত সম্ভাবনাময় রাসেলকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে নির্মমভাবে হত্যা করে ঘাতক চক্র।

খেলাধুলা মানসিক শক্তি যোগায়

তরুণ প্রজন্মের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে খেলাধুলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, ক্রিকেট ও ফুটবল নিয়েই আমরা সব সময় মেতে থাকি। তবে টেনিসও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা খেলাধুলার প্রতি সবসময় গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছি। কারণ খেলাধুলায় তরুণ প্রজন্ম যত বেশি অংশ নেবে, ততই তাদের মানসিকতা ভালো হবে, শারীরিকভাবে সুস্থ হবে ও নিজেদের আরো বেশি তৈরি করতে পারবে। মোটকথা খেলাধুলা আমাদের ছেলে-মেয়েদের মানসিক শক্তি যোগায়।

শেখ রাসেল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপ টেনিস টুর্নামেন্ট-২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও কূটনীতিকরা ২০শে নভেম্বর গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে ক্রিকেট এবং ফুটবল জনপ্রিয় হলেও এখন মানুষ টেনিসের সঙ্গেও পরিচিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার টেনিস কোর্ট তৈরি; প্রশিক্ষণ দেওয়াসহ স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছেলে-মেয়েদের এই খেলায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

খুলনায় শেখ রাসেল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপ টেনিস টুর্নামেন্ট-২০১৯ সফলভাবে আয়োজন করায় আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী।

এ টুর্নামেন্টে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশসহ মোট ১৯টি দেশের ২১টি ক্লাব অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় পুরুষ এককে ভারতের নিতিন কুমার সিনহা ও মহিলা এককে মঙ্গোলিয়ার মারালোগো চগসোমাজাত শিরোপা জয় করেন। ■

কথা বলা রোবট

শাহানাজ সুলতানা

এটি একটি অত্যাধুনিক কথা বলা রোবট। নাম তার রবিন। বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষায় কথা বলতে পারে। শুধু কথা নয়, রবিন বলতে পারে তার আবিষ্কারক খুদে বিজ্ঞানীর নামও। তার দেশ, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির নামসহ যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে অকপটে। কোথাও আগুন লাগলে খবর দিতে পারে ফায়ার সার্ভিসে। বন্ধুরা, অবাক হলেও সত্যি! এমনি একটি রোবট আবিষ্কার করেছে বরিশালের আগৈলঝড়া উপজেলার গৈলা কালুপাড়া গ্রামের শিক্ষার্থী শুভ কর্মকার। সে সরকারি গৈলা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র।

ছোটোবেলা থেকেই শুভ বিভিন্ন বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। জিতে নেয় পুরস্কারও। আর এসব কাজে থাকতে থাকতে এক সময় ইচ্ছা জাগে একটি রোবট বানানোর। আর সেটি হবে গতানুগতিক রোবট থেকে একটু আলাদা। সে লক্ষ্যে ২০১৮ সালের মে মাসে শুভ শুরু করে রোবট বানানোর কাজ, তা শেষ হয় ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে। আমেরিকার একটি কার্টুন শো সুপার হিরোর নামানুসারে রোবটটির নাম রাখা হয় 'রবিন'। ইতোমধ্যে রোবটের কথা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। রবিনের আবিষ্কারক শুভ মূলত ইন্টারনেট ও ইউটিউব থেকে বিভিন্ন তথ্য ও ভিডিও দেখেই রোবটি তৈরি করেছে। একে আরো উন্নত করতে এখন কাজ চলছে। বর্তমানে এটির দৃষ্টিশক্তি নেই, আগামীতে সে সবাইকে দেখতে ও চিনতে পারবে। এই রোবটের বড়ো দিক হলো, এটি অনেক কিছু নিজে নিজে শিখতে পারে। এ জন্য কোনো কোডিং-এর প্রয়োজন হয় না। ■

স্বাস্থ্য প্রতিবেদন

যক্ষ্মার নতুন ওষুধ

মো. জামাল উদ্দিন

জটিল যক্ষ্মা চিকিৎসায় নতুন ওষুধ মানুষের হাতে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) এই নতুন ওষুধের অনুমোদন দিয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বর নাগাদ ওষুধটি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আসবে। জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির কর্মকর্তারা বলেছেন, বাংলাদেশে ওষুধটি ব্যবহারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে।

ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা (এক্সটেনসিভ ড্রাগ রেসিসট্যান্ট টিউবারকিউলিসিস বা এক্সডিআর টিবি) চিকিৎসায় এই ওষুধ ব্যাপকভাবে কাজে লাগবে। বর্তমানে জটিল যক্ষ্মার রোগী সুস্থ করতে ২৪ মাস সময় লাগে। নতুন এই ওষুধে সময় লাগবে ৬ মাস। যেসব যক্ষ্মা রোগী প্রচলিত ওষুধে ভালো হয় না (অর্থাৎ মাল্টি ড্রাগ রেসিসট্যান্ট বা এমডিআর টিবি, তাদের চিকিৎসায়ও এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে।

প্রোটোমানিড নামের এই নতুন ওষুধ তৈরি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের আরটিআই ইন্টারন্যাশনালের বিজ্ঞানী ডোরিস রৌজ ও তাঁর সহযোগীরা। আন্তর্জাতিক যক্ষ্মা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান টিবি অ্যালায়েন্সের সহযোগিতায় ডোরিস রৌজ ২০০০ সাল থেকে এই ওষুধ তৈরির কাজ শুরু করেন। ২০১৯ সালের ১৪ই আগস্ট নতুন ওষুধের অনুমোদন দিয়েছে এফডিএ। এফডিএ কড়া নিয়মনীতি মেনে ওষুধ অনুমোদন দেয়।

নতুন এই ওষুধ বিশ্ববাসীকে আশার আলো দেখিয়েছে। এখন এক্সডিআর যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা চলে ২৪ মাস। প্রথম ৬ থেকে ১২ মাস প্রতিদিন একটি করে ইনজেকশন দিতে হয়। এটা প্রয়োগে রোগীর দেহে অসহ্য যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। এখন নতুন ওষুধে সাধারণ যক্ষ্মা রোগীর মতো জটিল যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীদেরও চিকিৎসা চলবে ছয় মাস। মুখে খাওয়ার ওষুধেই তাদের চিকিৎসা চলবে।

এক্সডিআর যক্ষ্মা অত্যন্ত জটিল রোগ। সাধারণ যক্ষ্মা রোগীকে ছয় মাস নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হয়। নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়মিত ওষুধ না খেলে বা পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ না খেলে যক্ষ্মার জীবাণু ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। সেটাই ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা বা এমডিআরটিবি। এই রোগে আক্রান্তরা সরাসরি এমডিআর যক্ষ্মার জীবাণু ছড়ায়। আবার এমডিআর যক্ষ্মার রোগী যদি নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ম মেনে ৯ থেকে ১৮ মাস ওষুধ সেবন না করে, তাহলে ওই জীবানু আরো বেশি মাত্রায় ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। এটাই এক্সডিআর যক্ষ্মা। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কোনো এক্সডিআর যক্ষ্মা রোগী চিকিৎসায় সুস্থ হয়নি।

গত প্রায় ৫০ বছরে যক্ষ্মা চিকিৎসার মাত্র তিনটি ওষুধের অনুমোদন দিয়েছে এফডিএ। অন্য দুটি ওষুধ হচ্ছে বেডাকুলাইন ও ডেলামিনিড। পাঁচ বছর আগে ওষুধ দুটি বাজারে আসে। নতুন এই ওষুধ বেডাকুলাইন ও লাইনজোলিড ওষুধের সঙ্গে একই সময়ে সেবন করতে হবে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বে প্রতিবছর যক্ষ্মায় ১৬ লাখ মানুষ মারা যায়। অর্থাৎ দিনে সাড়ে তিন হাজারের বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে এই সংক্রামক রোগে। বিশ্বে আর কোনো সংক্রামক রোগে এত মানুষ মারা যায় না। ■

সাঁতারে এনির বাজিমাত

জান্নাতে রোজি

জাতীয় বয়সভিত্তিক সাঁতারে ৭টি ইভেন্টে সোনা জিতেছে কিশোরী এনি খাতুন। ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে গড়েছে নতুন জাতীয় রেকর্ড। ১১-১২ বছর বিভাগে এনি জিতেছে এবারের আসরের সেরা সাঁতারুর পুরস্কার। সম্প্রতি দেশে বয়সভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় এ সাফল্য পায় এনি।

গত তিন বছর ধরে 'সেরা সাঁতারুর খোঁজে' কর্মসূচির আওতায় ৪২ জন সাতারুকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছে সাঁতার ফেডারেশন। এদেরই অন্যতম কুষ্টিয়ার মেয়ে এনি খাতুন। সে ৭টি ইভেন্টে অংশ নিয়ে ৭টিতেই সোনা জিতে।

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে কিশোরীর নতুন উদ্ভাবন

গাড়ি চালানোর সময় 'ব্লাইন্ড স্পট' খুবই বিপজ্জনক। আর ব্লাইন্ড স্পট হলো গাড়ির সামনের কাচ যে ফ্রেমের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে তার দুই পাশ। অর্থাৎ যে অংশ চালকের দৃষ্টিপথে বাধা তৈরি করে। ঐ পাশে মানুষের উপস্থিতি চালক দেখতে না পাওয়ায় অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এই জটিল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে খুদে এক বিজ্ঞানী। নাম অ্যালাইনা গাসলার। পেনসিলভানিয়ার ১৪ বছরের কিশোরী অ্যানাইনা এ সমস্যার সমাধান করে জিতে নিয়েছে 'ব্রডকম মাস্টার্স' পুরস্কার।

প্রজেক্টর, ওয়েবক্যাম এবং ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারে তৈরি কিছু দ্রব্য দিয়ে একটি পরীক্ষামূলক সংস্করণ বানিয়েছে গাসলার। ওয়েবক্যাম যাত্রীর আসনের বাইরে লাগানো থাকবে। আর প্রজেক্টরটি এমনভাবে লাগানো থাকবে, যাতে আলো ঠিক ঐ ব্লাইন্ড স্পটে পড়ে। ফলে ক্যামেরায় যা ধারণ করা হবে, তাই প্রজেক্টরের মাধ্যমে ব্লাইন্ড স্পটে ফেলা হবে। এতে চালকের ওই অংশ দেখতে আর কোনো সমস্যা হবে না। গাসলার এটাতে এমন এক ধরনের ফেব্রিক ব্যবহার করেছে, যাতে চোখে আলোর ঝলকানির সমস্যা তৈরি না হয়।

উল্লেখ্য, ব্রডকম মাস্টার্স হলো যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ক প্রতিযোগিতা।

খুদে বিজ্ঞানী ক্যারোলিন ক্রাউচলে

ঘণ্টায় ৬০০ মাইল বেগে ট্রেন চালানোর হাইপারলুপ ধারণাটি প্রথম আসে গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার-এর প্রধান এলন মাস্কের কাছ থেকে। এই ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে এক প্রতিযোগিতায় নিউইয়র্কের ১৩ বছর বয়সি কিশোরী ক্যারোলিন ক্রাউচলে একটি ডিজাইন উপস্থাপন করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সম্প্রতি বার্তা সংস্থা সিএনএন এ খবরটি নিশ্চিত করেছে। ■

নয় বছরেই কিস্তিমাত

মেজবাউল হক

নাম তার মনন রেজা নীড়। বয়স মাত্র ৯ বছর। পড়ছে চতুর্থ শ্রেণিতে নারায়ণগঞ্জের ফিলোসোফিয়া স্কুলে। এ বয়সেই এবারের জাতীয় দাবায় গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ড্র করে সবাইকে রীতিমতো চমকে দিয়েছে। অনূর্ধ্ব ৯ বছরের দাবাড়ুদের মধ্যে ফিদের রেটিং হিসেব করলে বিশ্বে তার অবস্থান তৃতীয় এবং এশিয়ায় প্রথম।

বাবা নাজিম রেজা কম্পিউটারে বসে দাবা খেলতেন। বাবার খেলা দেখেই মননের দাবার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। বাবার সঙ্গে মার্কেটে ক্রিকেট বল আর ব্যাট কিনতে গিয়ে হঠাৎ চোখ গেল দাবা সেটের দিকে। আবদার করতেই বাবা খুশিমনে কিনে দিলেন। দাবার প্রতি ছেলের আগ্রহ দেখে নাজিম রেজা তাকে ভর্তি করিয়ে দেন নারায়ণগঞ্জের নাহার চেজ একাডেমিতে। ওখানে শিখল কীভাবে দাবার চাল দিতে হয়। ধীরে ধীরে রপ্ত করতে থাকে দাবার খুঁটিনাটি বিষয়ও।

২০১৫ সালেই প্রথম অংশগ্রহণ করে নাহার চেজ অ্যাকাডেমি আয়োজিত বিজয় দিবস চেজ টুর্নামেন্ট ২০১৫-এ। এতে রানার আপ হয় মনন। পরবর্তীতে অংশগ্রহণ করে ঢাকায় বিভিন্ন টুর্নামেন্টে। এরই মধ্যে মনন কমনওয়েলথ টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে দুই বার। প্রথম বার ২০১৭ সালে আন্ডার ৮-এ সিলভার মেডেল পেলেও ২০১৮ সালে হয় চ্যাম্পিয়ন। এ টুর্নামেন্টে প্রায় ৮-১০টি দেশের খুদে দাবাড়ুরা অংশগ্রহণ করে। ২০১৭ সালেই শ্রীলঙ্কার ওস্কাদুয়া শহরে যায় মনন। ওখানে একটি টুর্নামেন্টে তিনটি ইভেন্টের মধ্যে দুটিতেই গোল্ড মেডেল এবং একটিতে সিলভার মেডেল পায়। এছাড়াও ২০১৯ সালে জাতীয় দাবায় গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়ার সঙ্গে ড্র করে। আবদুল্লাহ আল রাকিব, নিয়াজ মোর্শেদদের সঙ্গেও খেলেছে এই খুদে দাবাড়ু। হারিয়েছে চারজন ফিদে মাস্টারকে। এরই মধ্যে দাবা খেলার কল্যাণে সফর করেছে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, উজবেকিস্তান এবং ভারতে ।

অন্য খুদে দাবাড়ুদের মতোই স্বপ্ন গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার। অবসর পেলেই ইউটিউবে দাবা খেলা দেখে। মাঝেমধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে খেলাধুলাও করে। এছাড়া ছবি আঁকতে ভালোবাসে মনন। ■

পোষা প্রাণীর দিবাযত্ন কেন্দ্র

সৈয়দা জান্নাতুন নাঈম

বাংলাদেশে এই প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে চালু হয়েছে পোষা প্রাণীর দিবাযত্ন কেন্দ্র। কেউ যখন কোনো প্রাণী পুষে তখন অনেক সময় তাকে প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে এমনকি দেশের বাইরেও যেতে হয়। এক্ষেত্রে একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তার পোষা প্রাণীটি। প্রাণীটির মায়ায় তখন অনেকে বাইরে যাওয়াই বন্ধ করে দেন। সম্প্রতি এ সমস্যার সমাধান নিয়ে এসেছে উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত এলডি ভেটেরিনারি হসপিটাল অ্যান্ড ডে কেয়ার সেন্টার। এখানে দীর্ঘ সময়ের জন্য কারো পোষা প্রাণীকে রাখতে চাইলে তার জন্য হোটেল ব্যবস্থা রয়েছে। ২রা নভেম্বর উত্তরা রবীন্দ্র স্মরণির ১৪/এ নম্বর ভবনে স্থাপিত এই হাসপাতালের উদ্‌বোধন করেন মাগুরা ২ আসনের সাংসদ বীরেন সিকদার। এ সময় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিরেশ রঞ্জন ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি উদ্‌বোধন হলেও এলডি হসপিটাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তারা চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই এখানে পরীক্ষামূলকভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরমধ্যে প্রায় ৬০০ প্রাণী এখানে চিকিৎসা নিয়েছে যার ৭০ শতাংশই বিড়াল। বাকি প্রাণীদের মধ্যে বেশিরভাগ কুকুর। এছাড়া খরগোশ, গিনিপিগ, কবুতরসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখিও রয়েছে।

মানুষের চিকিৎসার জন্য গড়ে তোলা অন্যান্য হাসপাতালের মতোই এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চেম্বার, আধুনিক অপারেশন থিয়েটার, জরুরি বিভাগসহ রয়েছে প্যাথলজি পরীক্ষার সুযোগও। এছাড়াও আছে ডিজিটাল এক্সরে, আলট্রাসনোগ্রাফি, ইসিজি ইত্যাদি। এখানে পোষা প্রাণী রাখার জন্য কেবিন এমনকি তাদের খেলাধুলার ব্যবস্থাও রয়েছে।

পোষা প্রাণীদের দিবাযত্ন কেন্দ্র ও হোটেল ব্যবস্থা চালুর যৌক্তিকতা সম্পর্কে হাসপাতালটির চীফ ভেটেরিনারি কনসালটেন্ট মাকসুদুল হাসানের মতে, বাড়িতে দেখাশুনা করার মতো লোক না থাকলে অনেকে পোষা প্রাণীটিকে বাসায় রেখে অফিসে কাজে মনোযোগ দিতে পারেন না। কারণ এরা অনেকের কাছে তাদের সন্তানের মতো। এছাড়া বিদেশ ভ্রমণসহ দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে ঘরের পোষা প্রাণীটিকে নিয়ে বিপাকে পড়তে হয়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র ও হোটেল ব্যবস্থাটি চালু করা হয়। ■

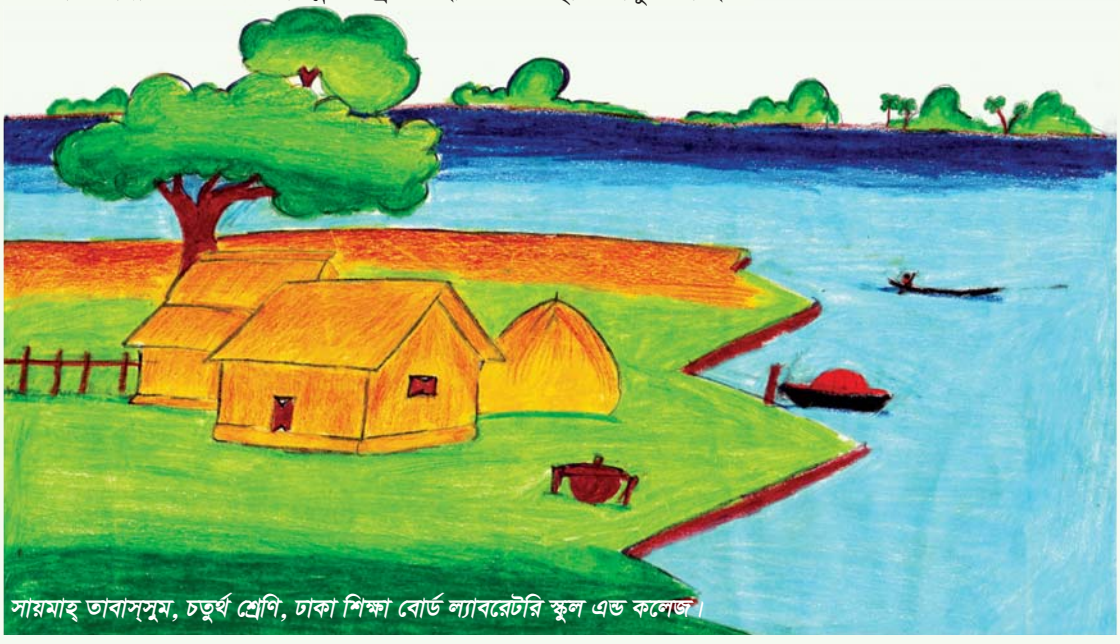

সায়মাহ্ তাবাস্‌সুম, চতুর্থ শ্রেণি, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ।

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সবচেয়ে দ্রুতগতির পিঁপড়া

প্রাণিজগতের সবচেয়ে পরিশ্রমী প্রাণী হিসেবে পিঁপড়া পরিচিত। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রায় ২২ হাজার প্রজাতির পিঁপড়ার সন্ধান পেয়েছেন। এর মধ্যে 'সাহারান সিলভার' পিঁপড়া সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন। এরা সেকেন্ডে ৮৫৫ মিলিমিটার (১০০০ মি.মি.-এ ১ মিটার) দূরত্ব অতিক্রম করে। মানে সেকেন্ডে ৫০ বার। এই প্রজাতির পিঁপড়ারাই পিঁপড়াদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতির। গবেষকরা জানিয়েছেন, সাহারা মরুভূমিতে মধ্য দুপুরের তাপমাত্রা ৬০° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। এই তাপমাত্রায় সাহারান সিলভার পিঁপড়া অবলীয়ায় সর্বোচ্চ গতি রেখে ছুটতে পারে। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, পিঁপড়াগুলো হাঁটা শুরুর পর এক পর্যায়ে ছুটতে থাকে। এ সময় প্রতি পদক্ষেপে তাদের ছয়টি পায়ের প্রতিটি পা মাটি স্পর্শ করে মাত্র সাত মিলি সেকেন্ডের জন্য!

নিরামিষভোজী মাকড়সা

মাকড়সা প্রথম স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। মাকড়সার জাল তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাকড়াসা অনেক রকমের হয়। কেউ জাল বোনে। কেউ লাফিয়ে শিকার ধরে। সব মাকড়সারই একজোড়া বিষগ্রন্থি আছে। তবে সবাই প্রাণঘাতী না হলেও এদের অনেকের কামড় খুব বিষাক্ত। মাকড়সার কথা ভাবলে তার জাল আর সেই জালে ধরা পড়া বেচারা পোকার কথাই প্রথমে মনে আসে। মাকড়সারা পোকামাকড় খেয়ে উদরপূর্তি করে, তাই তারা যে আমিষভোজী সেটা আমরা সবাই জানি। তবে বিজ্ঞানীরা বের করেছেন, মাকড়সারা আমিষের পাশাপাশি কিছুটা নিরামিষও খায়। আমরা মানুষেরা খাবারের পাশাপাশি যেমন সালাদ বা সবজি খেয়ে থাকি, মাকড়সারাও তেমনি সবজি খেয়ে থাকে। 'অর্ব উইভার' স্পাইডারের মাঝে এ অভ্যাসটি দেখা যায়। তাদের পাতা জালে আমিষের উৎস সমৃদ্ধ অনেক পোকা, ফুলের পরাগ, ধুলোবালি ও ছত্রাকের রেণু ধরা পড়ে। যা মাকড়সারা ফেলে দেয় তো না-ই বরং সবকিছু মিলিয়ে তারা চমৎকার 'ব্যালান্সড' ডায়েট বজায় রাখে।

উচ্চ স্বরের পাখি

উচ্চ শব্দে মাইক বা গান বাজলে আমাদের কানের যে কী অবস্থা হয় তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু উচ্চ স্বরের পাখি! হ্যাঁ বন্ধুরা, বিজ্ঞানীরা এমন একটি পাখির সন্ধান পেয়েছেন। যার ডাকের শব্দ উচ্চ শব্দে মাইক বাজানোর মতোই। আমাজন অঞ্চলের 'বেলবোর্ড' পাখিটিই হলো সবচেয়ে উচ্চ স্বরের পাখি। প্রাপ্তবয়স্ক বেলবোর্ডের ওজন মাত্র ২৫০ গ্রাম। আকারে দেখতে ছোটো পাখিটির গলার আওয়াজ কিন্তু মোটেই ছোটো নয়। এদের ডাকের তীব্রতা ১১৬ ডেসিবল পর্যন্ত হয়। বিশ্বের সর্ববৃহৎ চিরহরিৎ বন আমাজনের ব্রাজিল অংশের উত্তরাঞ্চলীয় পার্বত্য এলাকায় এই পাখির ডাকের স্বর রেকর্ড করা হয়।

বানরের নতুন প্রজাতি

প্রজাতি কী? প্রজাতি হলো মূলত জীবগোষ্ঠী। বলাবাহুল্য, প্রজাতির প্রত্যেকেরই রয়েছে আলাদা প্রজনন ক্ষমতা। যে প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে পূর্ববর্তী কোনো প্রজাতি থেকে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়, তাকে প্রজাতিকরণ (Speciation) বলে। 'পিগমি মারমোসেট' এমনই একটি বানর প্রজাতি। এরা পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো বানর। মারমোসেটের দুটি আলাদা প্রজাতি রয়েছে। পিগমি মারমোসেটের দুটি প্রজাতি প্রায় ৩ মিলিয়ন বছর আগে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। আমাজন বনের পশ্চিমাংশে পিগমি মারমোসেটদের বসবাস। এরা পতঙ্গভোগী প্রাণী। প্রতিটি বানরের ওজন মাত্র ১০০ গ্রাম হয়ে থাকে। আমাজন নদীর উত্তর পাশের মারমোসেটদের গায়ে হালকা ডোরাকাটা দাগ থাকে। আর দক্ষিণ পাশের মারমোসেটরা গাঢ় ডোরাকাটা দাগের হয়।

ল্যারি দ্য ক্যাট

'ল্যারি দ্য ক্যাট' একটি বিড়ালের নাম। যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সময় নিয়োগ পেয়েছিল-ল্যারি দ্য ক্যাট। বেক্সি (ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ) ইস্যুর জের ধরে এরপর দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদে তিনবার পরিবর্তন এসেছে। তাঁদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিসভায়ও কমবেশি পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু ল্যারির পদে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের এই কর্মীর কাজ ইঁদুর শিকার।

'ল্যারি দ্য ক্যাট' যুক্তরাজ্য সরকারের 'চিফ মাউসার' অর্থাৎ ইঁদুর ধরার জন্য নিযুক্ত প্রধান বিড়াল। তবে এ কাজে ল্যারির অদক্ষতা নিয়েও কম রসিকতা হয়নি। একবার ক্যামেরনের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ানো ইঁদুর ধরতে অনীহা দেখায় ল্যারি। ব্রিটিশ গণমাধ্যমকর্মী তাই তার নাম দিয়েছে 'লেজি ল্যারি' (অলস ল্যারি)।

তাসফিয়া জামান তাসনিম, চতুর্থ শ্রেণি, পাবুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাপাসিয়া গাজীপুর

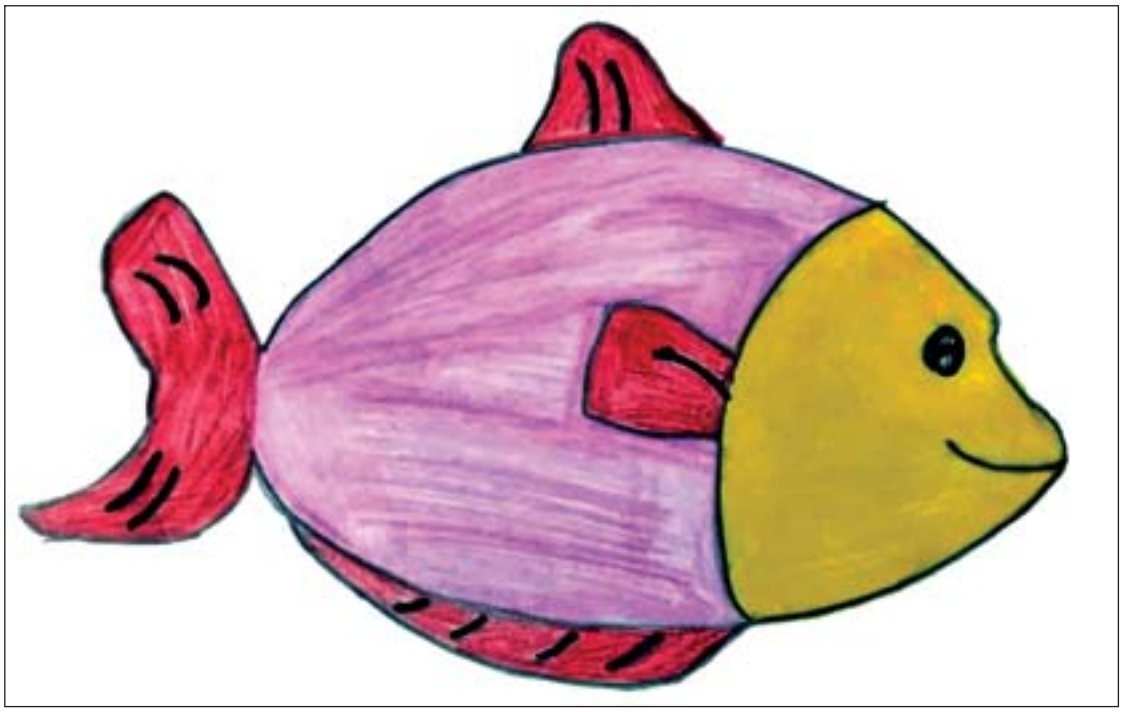

আয়ান হক ভূঁঞা, নার্সারি শ্রেণি, স্টার হাতেখড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দ ধাঁধা

পাশাপাশি: ১. পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ, ৫. উত্তর আফ্রিকার একটি দেশ, ৭. পারস্য কোন দেশের পূর্বনাম, ৮.পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, ১০. ব্রাজাভিল যে দেশের রাজধানী, ১১. হাজার পাহাড়ের দেশ

উপর-নিচ: ১. মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, ২. সেনেগালের রাজধানী, ৩. মধ্যপ্রাচ্যের একটি দ্বীপ রাষ্ট্র, ৪. উইন্ডহোক যে দেশের রাজধানী, ৬. উত্তর আমেরিকার দেশ,৭. ১৯৩২ সালে স্বাধীনতা অর্জন করা একটি দেশ, ৯. ইয়ারেন যে দেশের রাজধানী

■	■	১		২	■	■	৩
৪	■		■		■	■	
৫			■		■	■	
	■	■	৬	■	■	■	
	■	■		■	৭		
■	৮	৯		■		■	■
■	■		■	■	১০		■
■	■	১১			■	■	■

ব্রেইনই কুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৬	/		+	৫	=	
/	■	+	■	-	■	-
	*	১	+		=	৫
+	■	−	■	-	■	/
৭	-		/	১	=	
=	■	=	■	=	■	=
	-	১	*			৭

গত সংখ্যার সমাধান

■	■	কা	না	ডা	■	■	বা
না	■	তা	■	কা	■	■	হ
মি	শ	র	■	র	■	■	রা
বি	■	■	মে	■	■	■	ই
য়া	■	■	ক্সি	■	ই	রা	ন
■	মো	না	কো	■	রা	■	■
■	■	উ	■	■	ক	গো	■
■	■	রু	য়া	ভা	■	■	■

গত সংখ্যার সমাধান

৬	/	২	+	৫	=	৮
/	■	+	■	-	■	-
৩	*	১	+	২	=	৫
+	■	−	■	-	■	/
৭	-	২	/	১	=	৫
=	■	=	■	=	■	=
৯	-	১	*	২		৭

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: অকালকুষ্মাণ্ড, বিরলপ্রজ, কারাদণ্ড, দরাজ, চরকা, পারদ, আখ্যা, জনসংখ্যা, আম, গোলাম, লাভ

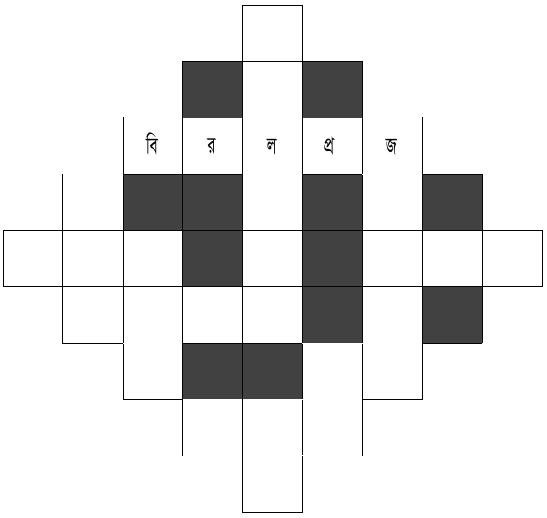

গত সংখ্যার সমাধান:

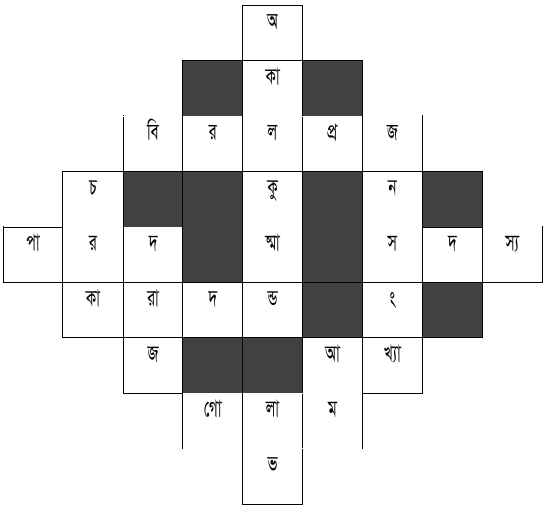

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিক ভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৪৫			৪২		৩৮	৭		৯
		৫২		৪০			৫	
	৫০		৫৪		৩৬	১		
৪৮		৫৬		৩৪			৩	
	৫৮		৭২	৭১	৩২		২৮	
	৭৯					৩০		
৬১		৮১			২২		২৬	
	৭৭		৭৫			২৪		
৬৩				৬৭	২০			১৭

গত সংখ্যার সমাধান:

৪৫	৪৪	৪৩	৪২	৩৯	৩৮	৭	৮	৯
৪৬	৫১	৫২	৪১	৪০	৩৭	৬	৫	১০
৪৭	৫০	৫৩	৫৪	৩৫	৩৬	১	৪	১১
৪৮	৪৯	৫৬	৫৫	৩৪	৩৩	২	৩	১২
৫৯	৫৮	৫৭	৭২	৭১	৩২	২৯	২৮	১৩
৬০	৭৯	৮০	৭৩	৭০	৩১	৩০	২৭	১৪
৬১	৭৮	৮১	৭৪	৬৯	২২	২৩	২৬	১৫
৬২	৭৭	৭৬	৭৫	৬৮	২১	২৪	২৫	১৬
৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	২০	১৯	১৮	১৭

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়

সম্পাদক, নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।

ই-মেইল: editornobarun@dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বন্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-44, No-4, October 2019, Tk-20.00

শুচি ইসলাম, সপ্তম শ্রেণি, মহেশপুর সরকারি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা